وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

● ৫ম বর্ষ ● ৮ম সংখ্যা ● জুন ২০২১

Web : www.al-itisam.com

আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদু'আ হতে বেঁচে থাকো, যদিও সে ব্যক্তি কাফের হয়। কেননা আল্লাহ এবং তার দু'আ (কবুলের) মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না'

(সিলসিলা ছহীহা, হা/৭৬৭)।

সূচিপত্র

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.

السنة:٥، شوال و ذو القعدة ١٤٤٢ ﻫ/ يونيو ٢٠٢١ م العدد:٨، الجزء:٥٦

تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش

رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM

Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**

Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**

Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;

Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

আল-ফাতেহ গ্র্যান্ড মসজিদ, বাহরাইন : বিশ্বের অন্যতম বৃহদায়তন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত মসজিদটি বাহরাইনের মানামার জুফায়েরে অবস্থিত। ৬ হাজার ৫শ বর্গমিটার আয়তনবিশিষ্ট মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার ও প্রস্থ ৭৫ মিটার এবং এতে ৪টি গম্বুজ রয়েছে। একসাথে ৭ হাজার মুছল্লী ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এই মসজিদটি ১৯৮৬ সালে শেখ ঈসা ইবনু সালমান আল-খালীফার শাসনামলে নির্মিত হয় এবং ২০০৬ সালে এর নামকরণ করা হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪২ || ঈসায়ী ২০২১ || বঙ্গীয় ১৪২৮

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জুন	১৯ শাওয়াল	সোমবার	৩ : ৪৪	৫ : ১০	১১ : ৫৬	০৩ : ১৬	০৬ : ৪২	০৮ : ০৮
০৫ ,,	২৩ ,,	শনিবার	৩ : ৪৪	৫ : ১০	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪৪	০৮ : ১০
১০ ,,	২৮ ,,	বৃহস্পতিবার	৩ : ৪৩	৫ : ১০	১১ : ৫৮	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৬	০৮ : ১৩
১৫ ,,	০৪ যুলকা'দাহ	মঙ্গল	৩ : ৪৩	৫ : ১০	১১ : ৫৯	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৫
২০ ,,	০৯ ,,	রবি	৩ : ৪৪	৫ : ১১	১২ : ০০	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৬
২৫ ,,	১৪ ,,	শুক্রবার	৩ : ৪৫	৫ : ১২	১২ : ০১	০৩ : ১৯	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : Universit of Islamic Science Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	
নারায়ণগঞ্জ	+১	০	
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-৩	০
টাঙ্গাইল	+১	+১	+৩
ফরিদপুর	-৫	-৪	-২
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	+১	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৫	+৪	+১
মাদারীপুর	+৩	+৩	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+২	+২	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-৩	-২	+২
শেরপুর	-২	-১	+৪
জামালপুর	-১	০	+৪
নেত্রকোনা	-৪	-৩	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-১	-২	-৮
কক্সবাজার	+১	-১	-১১
খাগড়াছড়ি	-৪	-৫	-৭
রাঙ্গামাটি	-৩	-৫	-৯
বান্দরবন	-২	-৪	-১০
কুমিল্লা	-২	-২	-৪
নোয়াখালী	+১	০	-৫
লক্ষীপুর	+২	+৩	+৪
চাঁদপুর	+১	০	-২
ফেনী	-১	-২	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৯	-৮	-৩
সুনামগঞ্জ	-১০	-৬	-৩
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৭	+১১
নাটোর	+৪	+৫	+৭
পাবনা	+৬	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+১	+২	+৪
বগুড়া	+১	+২	+৭
নওগাঁ	+৩	+৪	+৮
জয়পুরহাট	+৪	+৩	+৯

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	-১	+১	+৯
দিনাজপুর	+২	+৩	+১১
গাইবান্ধা	-১	০	+৭
কুড়িগ্রাম	-১	-১	+৮
লালমনিরহাট	-২	-১	+৯
নীলফামারী	০	+২	+১১
পঞ্চগড়	০	+২	+১৪
ঠাকুরগাঁও	+১	+৩	+১৩

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৭	+৪	+২
বাগেরহাট	+৬	+৫	০
সাতক্ষীরা	+৯	+৮	+৩
যশোর	+৭	+৭	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৬
ঝিনাইদহ	+৬	+৬	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৭
মাগুরা	+৫	+৫	+৩
নড়াইল	+৬	+৫	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৬	+৩	-২
পটুয়াখালী	+৫	+৪	-৩
পিরোজপুর	+৬	+৫	-১
ঝালকাঠি	+৫	+৪	-১
ভোলা	+৩	+২	-৩
বরগুনা	+৭	+৫	-২

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

৫ম বর্ষ
৮ম সংখ্যা

জুন-২০২১
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৮
শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ
১৪৪২

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

■ প্রধান সম্পাদক,
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
» হালাল হারামের ক্ষেত্রে একজন মুমিনের করণীয় ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» হজ্জ ও উমরা (পর্ব-১০) ০৭
-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

» ইমাম আবূ হানাফী রহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা (পর্ব-১৯) ১০
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া ১৩
-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী

» ইসলামের সুন্নাহর মর্যাদা (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১৫
-মূল : আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ : আব্দুর রহমান বিন লুতফুল হক ভারতী

» আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব (পর্ব-৬) ১৮
-মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

» একটি লিফলেটের ইলমী জবাব ২১
-আহমাদুল্লাহ

» রামাযান পরবর্তী আমলসমূহ ২৫
-ইবনু আকবার

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» ঈমান বৃদ্ধির উপায় ২৮
-অনুবাদ : মুরসালীন বিন আব্দুর রউফ

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ
» করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে? ৩০
-জুয়েল রানা

◈ দিশারী
» বিদায় রামাযান! অতঃপর... ৩৩
-জাবির হোসেন

◈ শিক্ষার্থীদের পাতা
» গ্রন্থ পরিচিতি-১১ : সুনানু আবী দাঊদ ৩৭
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ নারীদের পাতা
» নারীমুক্তির অগ্রদূত : বিশ্বনবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ৩৯
-মুহাম্মাদ দিদার বিন আজাহার

◈ কবিতা ৪২

◈ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪৩

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ধ্বংসের পথে বাংলাদেশের নদ-নদী

নদ-নদী মহান আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন, যাতে মানবজাতির জন্য রয়েছে শিক্ষা। এগুলো মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের সাক্ষী, যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ তার মা'বূদকে খুঁজে পাবে। তাই তো পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় নদীনালার কথা উল্লেখ করে মানুষকে চিন্তা-গবেষণা করতে বলা হয়েছে। নদ-নদী মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ। পৃথিবীবাসীর নানাবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে নদীনালায়। মহান আল্লাহ মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ সবার জীবনধারণের নানা উপকরণ ঢেলে দিয়েছেন এসব নদীনালায়। মানবসৃষ্টির সূচনা থেকেই নদীনালা মানুষের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আদিকাল থেকে কৃষিকাজে মানুষ এসব নদ-নদীর উপরই নির্ভরশীল। নদীনালার নানা ধরনের মাছ আজও মানুষের প্রিয় খাদ্য এবং পুষ্টির একটা বড় অংশ আসে এ মাছ থেকেই। অনেক সময় শামুক, ঝিনুক, এমনকি মণিমুক্তাও আহরিত হয় নদীনালা থেকে। একটা সময় নদ-নদীর সুপেয় পানি রান্নাবান্না ও পান করার কাজেও ব্যবহৃত হতে দেখা যেত, যা এখন তেমন নজরে পড়ে না। জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য, ভূ-প্রকৃতি রক্ষায় এসব নদ-নদীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। নদীর অপার সৌন্দর্য আমাদের মন জুড়িয়ে দেয়। এছাড়াও এসব নদীনালার রয়েছে আরো অনেক উপকারিতা।

গোটা মানবদেহে যেমন অসংখ্য শিরা-উপশিরা জালের মতো জড়িয়ে ধরে মানুষকে বেঁচে থাকার নানা উপকরণ সরবরাহ করছে প্রতিনিয়ত, ঠিক তেমনি অসংখ্য নদ-নদী প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে আগলে রেখেছে। সারাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য নদীনালা। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলি, শীতলক্ষ্যা, গোমতীসহ বাংলাদেশে প্রায় ৭০০টি নদী-উপনদী রয়েছে, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,১৪০ কি.মি.। এসব নদ-নদী নিয়ে রচিত হয়েছে কত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস আর নাটক। কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় নদীর রূপ-লাবণ্য তুলে ধরেছেনে একান্ত আপন করে। কাব্যিক ব্যঞ্জনায় নদী পেয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকও লিখেছেন হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে। কিন্তু সেসব এখন শুধুই কল্পকাহিনী। পরিসংখ্যান আর কবির বর্ণনার সাথে বাস্তবতার কোনোই মিল নেই। কারণ নাব্যতা হারিয়ে এবং দু'ধার থেকে সঙ্কুচিত হয়ে বেশিরভাগ নদীই আজ বিলীন হয়ে গেছে বা প্রায় বিলীনের পথে। নদীর অস্তিত্ব হচ্ছে তল, ঢাল আর তীর। এসবগুলোই সমানতালে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। 'আমাদের ছোটো নদী চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে'- কবির ছোট নদীর এ বর্ণনা যেন বড় নদীর ক্ষেত্রেও এখন মিলে যাচ্ছে। বড় বড় নদী আজ মরুভূমির মতো ধু-ধু বালুচরে পরিণত হয়েছে। খরার মৌসুমে বুঝাই যায় না যে, এগুলো নদী, না-কি মরুভূমি! ছোট ছোট অনেক নদীতে ধান পর্যন্ত চাষ হতে দেখা যায়। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু নদীসহ ঢাকার নদীগুলো তো রীতিমতো নর্দমায় পরিণত হয়েছে, যেখানে নাকে রুমাল ধরে ছাড়া যাওয়া কঠিন!

এর কারণ হিসেবে ভারতের বৈরী আচরণ যেমন রয়েছে, তেমনি নদীর সঙ্গে আমাদের অত্যাচারও যুক্ত হয়েছে। ভারত বাংলাদেশের বহু নদী শাসন ও শোষণ করছে। ভারতের ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধ ছাড়াও উজানে তৈরি করা ৪০টি ড্যাম ও ব্যারেজ পানির গতি পরিবর্তন করায় পানির অভাবে বাংলাদেশের নদ-নদী আজ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নদ-নদীর সাথে আমাদের শত্রুতাও বেড়ে গেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। নদীর তীর ও ঢাল অবৈধভাবে দখল করে গড়ে তোলা হচ্ছে বসতবাড়ি, শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। কথিত প্রভাবশালীরা জড়িত এসব দখলদারিত্বের সাথে। নদীগুলোকে দূষণযুক্ত করা হচ্ছে কলকারখানার বর্জ্য নিক্ষেপসহ নানা কায়দায়। যত্রতত্র খনন করে তোলা হচ্ছে বালি। ফলে নদী আর নদী থাকছে না। এর পানি ধারণক্ষমতা বহুগুণে হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের জন্য তৈরি হচ্ছে উভয় সংকট; খরার সময় আমরা পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আর বর্ষার মৌসুমে বণ্যায় তলিয়ে যাচ্ছি। হারিয়ে যাচ্ছে বহু প্রাণ; ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি। নদী হারানোয় প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যও ধ্বংস হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে ভূ-প্রকৃতি।

অতএব, এখনই সময় সচেতন হওয়ার ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার। এ পদক্ষেপ হতে হবে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে। রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ দখলদারি উচ্ছেদ, খনন প্রক্রিয়া ও দূষণমুক্ত করার কার্যকর পদক্ষেপ হাতে নিতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যোগাযোগ রক্ষা করে নদী-সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সর্বোপরি ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের প্রত্যেককেই সচেতন হয়ে নদী রক্ষায় কাজ করে যেতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

হালাল হারামের ক্ষেত্রে একজন মুমিনের করণীয়

*-মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল**

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ والْحَرَامَ بَيِّنٌ وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وهِيَ الْقَلْبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। নু'মান তাঁর আঙ্গুলদ্বয়কে তাঁর কানের নিকট নিয়ে গেলেন। নিশ্চয় হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। এ দুইয়ের মধ্যে অস্পষ্ট বিষয়গুলো আছে, যা বেশির ভাগ মানুষ জানে না। যে সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও সম্ভ্রমকে পবিত্র রাখবে। আর যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে পতিত হবে, সে হারামের মধ্যে পড়ে যাবে। (তার দৃষ্টান্ত হলো) ঐ রাখালের মতো, যে নিষিদ্ধ এলাকার সীমানায় গবাদিপশু চরায়। তাদের তার মধ্যে পতিত হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। মনোযোগ দিয়ে শোনো! নিশ্চয় প্রত্যেক শাসকের নিষিদ্ধ এলাকা রয়েছে। আল্লাহর নিষিদ্ধ (এলাকা) হলো তাঁর হারামকৃত বিষয়। মনোযোগ দিয়ে শোনো! নিশ্চয় শরীরে একটি মাংসপিণ্ড আছে। যখন মাংসপিণ্ডটি সুস্থ থাকে, তখন সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। যখন এই মাংসপিণ্ডটি নষ্ট হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। মনোযোগ দিয়ে শোনো! আর তা হচ্ছে ক্বলব বা অন্তর।[১]

হাদীছটির গুরুত্ব :

আল্লামা কিরমানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'শরীআতে এই হাদীছের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন'। এটি ঐ হাদীছগুলোর অন্যতম, যেগুলোর উপর ইসলামের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত। একদল মুহাদ্দিছ বলেছেন, 'এটি ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ'। বিদ্বানগণ বলেছেন, 'এই হাদীছটি', 'নিয়্যতের হাদীছ' এবং 'একজন ব্যক্তির আদর্শবান মুসলিম হওয়ার জন্য এতটুকু যাথেষ্ট যে, অনর্থক কথাবার্তা বর্জন করা' এই তিনটি হাদীছের উপর ইসলামের বিধি-বিধান আবর্তিত হয়। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'ইসলাম চারটি হাদীছের উপর প্রতিষ্ঠিত। উল্লিখিত তিনটি এবং তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতখন না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য করে'।[২] আল্লামা ইবনু দাক্বীক আল-ঈদ বলেছেন, 'এটি ইসলামী শরীআতের মূলনীতির সবচেয়ে বড় উৎস'।[৩]

আল্লামা জিরদানী বলেছেন, 'এ হাদীছের ব্যাপক উপকারিতা সম্পর্কে আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন। যে এই হাদীছে গভীর দৃষ্টি দিবে, সে শারঈ বিধান সংক্রান্ত সকল জ্ঞান এই একটিমাত্র হাদীছের মধ্যে খুঁজে পাবে। কারণ এটি হালাল গ্রহণ, হারাম বর্জন, সন্দেহপূর্ণ বিধান থেকে বিরত থাকা, দ্বীন ও সম্ভ্রম সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন, খারাপ ধারণা উদ্রেক করে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকা, নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়ানোর পরিণাম এবং আত্মার প্রভাব ও সংশোধনমূলক কাজ ইত্যাদি এই হাদীছটি শামিল করে'।[৪] এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বৃহৎ হাদীছ। হাদীছটি ইসলামের সকল মূলনীতি শামিল করে। এই হাদীছের শিক্ষা সমাজে বাস্তবায়িত হলে নবুঅতের জ্ঞানসমৃদ্ধ ফলক আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। রিসালাতের তাক আলোকিত হয়ে উঠবে। আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপক অর্থবোধক প্রাঞ্জল ভাষার অন্যতম এটি'।[৫]

ব্যাখ্যা :

এই হাদীছে দুটি মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যথা— (১) আমল বিশুদ্ধকরণ ও (২) আত্মাকে ত্রুটিমুক্তকরণ। অবস্থাগতভাবে এই সমস্যা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী জীবন গঠনের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংশোধনে এদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এই হাদীছে আলোচিত বিষয়গুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) স্পষ্ট হালাল : যার হালাল হওয়াতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা বা অসচ্ছতা নেই। অর্থাৎ যার হালাল হওয়া শরীআতের স্পষ্ট বা প্রকাশ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- মধু। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। আর আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(আল-মায়েদা, ৫/৫)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'এদের ব্যতীত অন্য সব নারীদের তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(আন-নিসা-৪/২৪)*।

---

* প্রভাষক, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৯; মিশকাত, হা/২৭৬২।

২. শারহু কিরমানী আলা ছহীহুল বুখারী, ১/২০৩; শারহু মুসলিম লিন নববী, ১১/২৩।

৩. ইবনু দাক্বীকুল ঈদ, শারহুল আরবাঈন আন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ২৪।

৪. জাওয়াহিরুল লুলুইয়্যাহ শারহুল আরবাঈন আন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ৬৪।

৫. তায়সীরুল আল্লাম শারহু উমদাতুল আহকাম, ৩/২৩৮।

(২) স্পষ্ট হারাম : যার হারাম হওয়া একেবারে স্পষ্ট এবং শারঈ দলীল দ্বারা প্রমাণিত। সব ধরনের অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত। যেমন শূকর, মদ, ব্যভিচার, আপন মা বা মেয়েকে বিবাহ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের মা, কন্যাকে (বিবাহ করা) হারাম করা হয়েছে' *(আন-নিসা-৪/২৩)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ স্থল প্রাণী শিকার করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, 'আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য....' *(আল-আ'রাফ, ৭/৩৩)*। তাছাড়া যেসব বিষয়ে শাস্তি কিংবা ভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোও হারামের পর্যায়ভুক্ত।

মুশতাবিহাত বা অস্পষ্ট বিষয় : এই পর্যায়ভুক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হালাল কিংবা স্পষ্ট হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়। এদের হালাল ও হারাম উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এদের মধ্যে উভয় দিকের সম্ভাবনা প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। এখানে কিতাব ও সুন্নাহর দলীলের অবস্থান এমন যে, এদের হালাল বা হারাম যে কোনোটি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এগুলোকে বাহ্যিকভাবে দেখলে মনে হবে যে, উভয় দিকের সম্ভাবনা সমানভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই অস্পষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে আলেমগণের তিনটি অবস্থান রয়েছে।

প্রথম মত : একদল আলেমের মতে, এখানে অস্পষ্ট বিষয় বলতে হারামকে বোঝানো হয়েছে। কেননা মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে অস্পষ্ট বিষয় থেকে বিরত থাকল, সে তার দ্বীন ও সম্ভ্রমকে পবিত্র করে নিল'। অর্থাৎ তার দ্বীন ও সম্ভ্রমকে প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া হতে রক্ষা করল। এ রকম অস্পষ্ট বিধানের ক্ষেত্রে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সন্দেহপূর্ণ স্থান থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যে এগুলোতে জড়িয়ে গেল, তার দ্বীন ও সম্ভ্রম অপবিত্রতার সাথে মিশে গেল। সে হারামের মধ্যে পড়ে গেল।

দ্বিতীয় মত : আরেক দলের মতে, সেগুলো হালাল। যেমন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে হারামের আশেপাশে ঘুরবে তার অবস্থা হবে ঐ রাখালের মতো, যে নিষিদ্ধ এলাকার সীমানায় গবাদিপশু চরায়'। এতে প্রমাণিত হয় এটি হালাল, কিন্তু এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকা তাক্বওয়ার লক্ষণ। তবে সুধী পাঠক! মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন, 'যে সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বিরত থাকল, সে হারাম থেকে আরও বেশি দূরে থাকল'। এর ব্যাখ্যা অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, 'যে এমন পাপ বর্জন করল যা তার নিকট অস্পষ্ট, সে প্রকাশ্য পাপ বর্জনের ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে গেল। সে মানহানিকর যে কোনো পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হলো'। এই হাদীছ থেকে স্পষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শারঈ আইন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। আর তা হচ্ছে, হারাম পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করে এমন সকল পথ বন্ধ করা। কাজেই বিবাহ বৈধ এমন নারীর সংমিশ্রণ, মুছাফাহা এবং নির্জন স্থানে তার সাথে সাক্ষাৎ করা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা এটি ব্যভিচারের পথে অগ্রসর হওয়ার অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। একইভাবে সরকারি পদে চাকরিধারী কিংবা সমাজের সুবিধাজনক পদাধিকারীর সাধারণ জনগণের উপঢৌকন গ্রহণ করা হারাম। কেননা এটি ঘুষের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

অতঃপর পূর্বে বর্ণিত অস্পষ্ট বিষয়কে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে এবং অন্তরে একে দৃশ্যমান করে উপস্থাপন করতে চমৎকার এক দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। অস্পষ্ট বিষয়ে পতিত ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এমন এক রাখালের সাথে, যে নিষিদ্ধ এলাকার সীমান্তে গবাদিপশু চরায়। অসাধারণ সবুজে-শ্যামলে ভরা সেই নিষিদ্ধ এলাকা। প্রচুর ঘাস আর রকমারি শ্যামলে পরিপূর্ণ একটি এলাকা, যা খুব সহজে যে কাউকে মোহিত করে। বিভিন্ন গাছপালা আর নানা লতা-পতায় ঘেরা শ্যামল দৃশ্য ক্ষুধার্ত গবাদিপশুকে খুব সহজে প্রলুব্ধ করে। এমন সংরক্ষিত চারণভূমির প্রান্তে চরতে থাকা গবাদিপশুর দৃষ্টি যখন সে ভূমিতে পড়ে, তখন তারা দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হয়। রাখাল তখন গবাদিপশুর নিয়ন্ত্রণে এত ব্যস্ত থাকে যে, সে অন্য কোথাও যাওয়ার আর সুযোগ পায় না। একটা সময় সে ক্লান্ত হয়ে যায়। তার অসতর্কতার সুযোগে গবাদিপশু তাকে ফাঁকি দিয়ে নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ করে এবং পুরো চারণভূমি ধ্বংস করে দেয়। ঠিক এমনই হবে অস্পষ্ট বিষয়ে জড়িত ব্যক্তির অবস্থা।

দুনিয়ার জীবনকে সমস্যামুক্ত করতে একজন সতর্ক মানুষ যেমন সতর্কতার সহিত জীবনযাপন করে, সরকারি বা ক্ষমতাধরের নিষিদ্ধ এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্ব অবস্থান করে, ঠিক তেমনি একজন মুমিন ঐ সব অস্পষ্ট বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখে, যেগুলো তার পরকালীন জীবনকে কষ্টকর বানিয়ে দেবে; জান্নাতপ্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবে। সম্মানিত পাঠক! মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করুন, প্রত্যেক শাসকের কিছু নিষিদ্ধ এলাকা রয়েছে। আর আল্লাহর নিষিদ্ধ এরিয়া হচ্ছে তাঁর হারামকৃত বিষয়সমূহ। আল্লাহ

তাআলা হলেন সত্যিকারের অধিপতি। সুদৃঢ় ও শক্ত জালের বুনন দিয়ে তিনি শরীআতকে ঘিরে রেখেছেন। দ্বীন ও দুনিয়ায় ক্ষতিকর প্রত্যেক বস্তুকে তিনি মানুষের জন্য হারাম করেছেন।

ক্বলব যেহেতু শরীরের নিয়ন্ত্রক তাই ক্বলবের সংশোধন হলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপনাআপনি বিশুদ্ধ হয়ে যায়। এই উদাহরণে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বলবের বর্ণনা করে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে ক্বলবের প্রভাব রয়েছে। তিনি বলেছেন, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো! নিশ্চয় শরীরে একখণ্ড মাংসপিণ্ড আছে। যখন মাংসপিণ্ডটা বিশুদ্ধ হয়, তখন সমস্ত শরীর বিশুদ্ধ হয়। আর যখন মাংসপিণ্ড নষ্ট হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। ক্বলবের দ্বারা নামকরণের কারণ হলো হৃদয় খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন হাদীছে এসেছে, 'আদম সন্তানের হৃদয় হাঁড়ির পনির চেয়ে অধিক পরিবর্তনশীল, যখন তা ফুটতে থাকে'।[৬] এই জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেশির ভাগ দু'আ হৃদয়ের পরিবর্তন কেন্দ্রিক। তিনি বলেছেন, 'হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী তুমি আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো'।[৭]

উল্লিখিত আলোচনা ব্যতীত মানুষের সুস্থতা-অসুস্থতা ক্বলবের সুস্থতা-অসুস্থতার উপর নির্ভরশীল। জান্নাত লাভে ধন্য হওয়া এবং ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য লাভ করা হৃদয়ের সংশোধন ও পরিচর্যার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সেদিন অর্থসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না। তবে যে পবিত্র হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হবে, (সে সফল হবে)' *(আশ-শুআরা, ২৬/৮৮-৮৯)*।

তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি মানুষ যেরূপ গুরুত্ব প্রদান করে, হৃদয়ের প্রতি সেরূপ গুরুত্ব প্রদান করে না। শারীরিক অসুস্থতা অনুভূত হলেই তাদেরকে খুব দ্রুত চিকিৎসকের নিকট যেতে দেখা যায়। কিন্তু তাদেরকে হৃদয় সংশোধনে চরম উদাসীন দেখা যায়। এক পর্যায়ে হৃদয় কালিমাযুক্ত হয়ে যায় এবং ঐ অবস্থার উপর আল্লাহ তাকে মোহর মেরে দেন। এরপর তার হৃদয় পথরের চেয়ে বেশি শক্ত হয়ে যায়। তার জাহান্নামের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আমরা এ থেকে মুক্তি চাই।

একজন আল্লাহভীরু মুমিন তার হৃদয়কে পরিচর্যা করে। সে তার থেকে পাপের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়। সে হৃদয়কে ব্যাপক পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখে। কারণ সে জানে হৃদয়কে ক্ষতিকর পথে পরিচালিত করার অনেক উপায় আছে। যখনই সে তার হৃদয়ে কঠোরতা লক্ষ্য করে, তখনই দ্রুত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। যাতে করে যে অবস্থার উপর থাকা তার জন্য প্রশংসনীয় সে আবস্থার উপর থাকতে পারে।

এভাবে সে এমন কোনো কাজে জড়ায় না, যার কারণে তার হারামে পতিত হওয়া প্রমাণিত হয়। অপরদিকে যে ব্যক্তি এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকে না, তার আত্মা এরূপ অস্পষ্ট কাজে জড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হয়ে যায়। হারামে পতিত হওয়ার জন্য শয়তান তার সহযোগী হয়ে কাজ করে, এমনকি হারামে পতিত হওয়ার জন্য তাকে চিৎকার দিয়ে আহ্বান করে। এই হাদীছের আর একটি রেওয়ায়েত আছে, যা এই অর্থই বহন করে। পাপে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে এমন কাজ করার জন্য যে ব্যক্তি উৎসাহী হবে, তার স্পষ্ট হারামে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। শয়তান তার সাথে মিশে তাকে পবিত্র অবস্থা থেকে অপবিত্র অবস্থায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। মুবাহ তথা শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত কাজে জড়ানোকে শয়তান তার জন্য আকর্ষণীয় করবে। এভাবে শয়তান একদিন তাকে অপছন্দনীয় কাজে জড়িত হতে উৎসাহ দিবে। এক সময় তাকে ছোট থেকে পর্যায়ক্রমে বড় গুনাহে জড়িয়ে ফেলবে। সে এতটুকু করেই ক্ষান্ত হবে না; সে তাকে দ্বীন ইসলাম থেকে বের করে ছাড়বে। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ সম্পর্কে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন, তাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন, যাতে তারা পথভ্রষ্ট না হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ঘোষণা এসেছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, শয়তান তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের আদেশ দিবে। ভ্রষ্ট হওয়ার পদস্খলন থেকে প্রত্যেক মুমিনের সতর্ক থাকা উচিত। শয়তানের ষড়যন্ত্র এবং তার কৌশল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

তৃতীয় মত : তৃতীয় আরেক দল রয়েছেন, যারা হাদীছে উল্লিখিত অস্পষ্ট বিষয়গুলোকে না হালাল, না হারাম বলেছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে হালাল ও হারামের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন। কাজেই আমাদের উচিত হবে, এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত না নেওয়া। এটিও তাক্বওয়ার পর্যায়ে পড়ে। এ জাতীয় বিষয়কে নিম্নের ঘটনা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ এবং আব্দ ইবনু যামআ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মধ্যে এক কিশোরের উত্তরাধিকার নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ আমার ভাই উতবা ইবনু ওয়াক্কাছ শপথ করে বলেছে যে, সে তার সন্তান। দেখুন! তার সাথে গঠনগত মিল আছে। আব্দ ইবনু যামআ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতার বাসায় জন্ম নেওয়া তার সন্তান সে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে দেখে বললেন, উতবার সাথে

---

৬. আহমাদ, হাকেম।
৭. তিরমিযী, হা/৩৫২২।

তার গঠনের স্পষ্ট মিল আছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আব্দ ইবনু যামআ! ছেলেটি তোমার। কারণ সন্তান তো তারই হয় যার বিছানায় প্রতিপালিত হয় আর ব্যভিচারী পাবে পাথর (সে কিছুই পবে না)। হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা করো। তারপর থেকে সে সাওদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে কখনও দেখেনি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাসায় প্রতিপালিত হওয়ার কারণে বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে ছেলেটিকে আব্দ ইবনু যামআ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর বলে ফয়সালা দিলেন। ফলে সে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী সাওদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর ভাই হয়ে গেল। কারণ সাওদা যামআর কন্যা। এটি একটি অনুমান নির্ভর ফয়সালা। অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে এই ফয়সালা ছিল না। উতবার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থেকে তিনি সাওদাকে পর্দা করতে বলেছেন। এটা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সতর্কতার জন্য করেছেন। এটা তাদের কাজ, যারা আল্লাহকে ভয় করে থাকেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জানা মতে যুবকটি যামআ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সন্তান হলেও অতিরিক্ত সতর্কতা থেকে সাওদাকে পর্দা করতে বলেছেন, যেখানে অন্যান্য ভাইয়ের ক্ষেত্রে পর্দা করতে বলেননি।

আদী ইবনু হাতিম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর নামে কুকুরকে শিকারে পাঠায়। সেখানে আমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুরকে দেখতে পাই। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি ঐ শিকারের গোশত খাবে না, কেননা তুমি তো তোমার কুকুরকে বিসমিল্লাহ বলে প্রেরণ করেছ, যা অন্য কুকুরের ক্ষেত্রে করনি। যে কুকুরকে বিসমিল্লাহ বলে পাঠানো হয়নি, তার শিকারে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থেকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম শিকারটিকে খেতে নিষেধ করেছেন। হতে পারে যে, তাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো দেবতার নামে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জাতীয় সন্দেহপূর্ণ কাজে জড়ানোকে কুরআনে 'ফিসক্ব' বলে অভিহিত করা হয়েছে। হালাল ও হারামের সম্ভাবনাময় অবস্থার প্রেক্ষিতে সতর্কতার অংশ হিসেবে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ঐ ফৎওয়া। এই অর্থ বোঝাতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে দেয়, তা বর্জন করো এবং যা তোমাকে সন্দেহমুক্ত রাখে, তা করো'।

একদল আলেমের মতে মুশতাবিহাত তথা অস্পষ্ট বিষয়গুলো তিনভাবে বিভক্ত। প্রথমত, মানুষ যা জানে যে, এটা হারাম। কিন্তু তারপরও এক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করে যে, এটি কি হারাম থেকে মুক্ত হয়েছে, না-কি এখানেও হারাম আছে। এর দৃষ্টান্ত যাকাত প্রদানের পূর্বে কোনো ব্যক্তির যাকাতযোগ্য মাল খাওয়া- যখন কেউ যাকাত প্রদানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। এটি হারাম বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ না যাকাত প্রদান সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে দলীল হলো আদি ইবনু হাতিমের বর্ণিত হাদীছটি।

দ্বিতীয়ত, এর বিপরীতে কোনো বস্তু মূলত হালাল হবে। কিন্তু বস্তুটির হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। যেমন কোনো ব্যক্তির স্ত্রী আছে। তার স্ত্রীর তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে তার সন্দেহ হওয়া অথবা কোনো দাসীর স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া— এ জাতীয় বিষয়গুলো বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে- যতক্ষণ না এদের হারাম হওয়া সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা যায়। এক্ষেত্রে দলীল হলো আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ বর্ণিত হাদীছটি। ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে পবিত্রতার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করার পর ওযূ ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কায় সন্দেহ পোষণ করে।

তৃতীয়ত, এমন সব বিষয় যার হালাল বা হারাম হওয়া কোনোটাই জানা যায় না। উভয়টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। একটিকে প্রাধান্য প্রদানের কোনো প্রমাণ নেই। এক্ষেত্রে উত্তম হলো এ জাতীয় বিষয় থেকে দূরে থাকা। যেমনটা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম পড়ে থাকা খেজুরের ক্ষেত্রে করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি ছাদাক্বার হওয়ার যদি আমি ভয় না করতাম, তবে আমি এটা খেয়ে ফেলতাম। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো বস্তুর হালাল বা হারাম হওয়ার হুকুম প্রদান করার কোনো বাস্তবতা নেই। যেমন বৈশিষ্ট্য বজায় থাকা সত্ত্বেও পানির ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এই মনে করে যে, গোপনে কোনো অপবিত্রতা এতে মিশে গেছে। এমন কথার কোনো ভিত্তি নেই। একইভাবে প্রস্রাবের কোনো চিহ্ন নেই এমন জায়গায় ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকা এই ভেবে যে, হতে পারে এখানে পেশাব ছিল কিন্তু শুকিয়ে গেছে। অথবা কোনো কাপড় ধৌত করা এই ভয়ে যে, সেখানে কোনো অপবিত্রতা লেগেছিল যা দেখা যায়নি। এগুলো বিষয় এমন যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা অপরিহার্য।

পরিশেষে, হালাল পথে জীবনযাপন করার জন্য আমাদের যে শিক্ষার প্রয়োজন, তার সকল উপাদান এই হাদীছে বিদ্যমান আছে। এই হাদীছের আলোকে মানুষ তার কর্মকাণ্ড সম্পাদন করলে সে সব ধরনের হারাম থেকে রক্ষা পাবে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সম্পাদিত কাজগুলো হালাল, না-কি হারাম তা বুঝতে ব্যাখ্যায় উল্লিখিত উদাহরণগুলো পরিপূর্ণ সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। জীবনের প্রতিটি কর্মের হালাল-হারাম সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে-বুঝে করতে পারি সেই চেষ্টা আমাদের প্রত্যেকের করতে হবে। আল্লাহ আমাদের হাদীছটির আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-১০)

(২) নখ কাটা : ইহরাম অবস্থায় হাত-পায়ের নখ কাটা বা তুলে ফেলা যাবে না। এটি নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই হুকুম।

(৩) সুগন্ধি ব্যবহার করা : শরীরে বা কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি ইহরাম অবস্থায় কেউ মারা গেলেও সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ....فَأَوْقَصَتْهُ .... فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ قَالَ أَيُّوبُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ...."

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি আরাফার ময়দানে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে অবস্থানরত ছিলেন। হঠাৎ তিনি বাহন থেকে নীচে পড়ে গেলে তার ঘাড় মটকে যায় এবং তিনি মারা যান। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বিষয়টি অবহিত করা হলে তিনি বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, দুই কাপড় দিয়েই তার কাফনের ব্যবস্থা কর, তাকে সুগন্ধি লাগিও না এবং তার মাথাও আবৃত কর না। (রাবী আইয়ুব বলেন) কারণ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।[১] এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না।

তবে ইহরাম বাঁধার আগে শুধু শরীরে (কাপড়ে নয়) সুগন্ধি মেখে নেওয়া যাবে, যা ইহরাম অবস্থায় অব্যাহত থাকলেও কোনো সমস্যা নেই।

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর গায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে ইহরাম খুলে ফেলার সময়ও সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।[২] এ হাদীছে প্রমাণিত হয়, ইহরামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না।

(৪) মাথা ও মুখ ঢাকা : পুরুষদের কোন কিছু দিয়ে মাথা ও মুখ ঢাকা নিষেধ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ أَوْ قَالَ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرَانٌ.

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুহরিম পুরুষ ব্যক্তি কোন ধরনের কাপড় পরতে পারবে বা কোন ধরনের কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকবে? রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, জামা, পায়জামা, পাগড়ি, ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে অর্থাৎ জুতা না পায়, তাহলে চামড়ার মোজা গিরার নিচে কেটে জুতার মতো করে পরতে পারে। আর টুপিযুক্ত জামাও পরবে না। অনুরূপভাবে জাফরান ও অরস (এক প্রকার উদ্ভিদের সুগন্ধি) লাগানো কোনো কাপড় পরিধান করবে না।[৩]

(৫) পুরুষদের সেলাই করা কাপড় পরিধান করা : মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি, মোজা পরতে পারবে না। তবে কেউ যদি সেন্ডেল না পায়, তাহলে মোজাকে টাখনুর নিচ পর্যন্ত কেটে পরতে পারবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরনের পোষাক পরবে? আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি এবং জাফরান ও অরস (এক প্রকার ঘাসের সুগন্ধি) লাগানো কাপড় পরিধান করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে টাখনুর নিচ পর্যন্ত মোজা কেটে (জুতার ন্যায়) পরবে।[৪] উল্লেখ্য, মোজা টাখনুর নিচ পর্যন্ত কাটার বিষয়টি পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়।[৫]

---

১. ছহীহ বুখারী, হা/১২৬৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১২০৬।
২. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৩৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৮৯; মিশকাত, হা/২৬৫১।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৪২; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭৭; নাসাঈ, হা/২৬৬৭।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৪২।
৫. দ্রষ্টব্য: ছহীহ বুখারী, হা/১৮৪১; ফিক্বহুস সুন্নাহ, পৃ. ৬২১।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরাফার মাঠে খুৎবা দিলেন এবং বললেন, মুহরিম ব্যক্তি সেলাইবিহীন লুঙ্গি না পেলে সেলাই করা পায়জামা পরবে।[৬]

উক্ত হাদীছসমূহ প্রমাণ করে, সেলাই করা কোনো কাপড় পরা যাবে না। যদি সেলাইবিহীন কাপড় না পায়, নিরুপায় হয়ে সেলাই করা কাপড় পরতে পারে।

মহিলারা সাধারণ ব্যবহার্য পোশাকেই ইহরাম বাঁধবে। তবে হাত মোজা এবং নেকাব পরবে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحَرَّمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুহরিম মহিলা মুখের উপর নেকাব পরতে পারবে না এবং হাত মোজা পরিধান করতে পারবে না।[৭] অবশ্য বেগানা পুরুষ সামনে পড়লে মুখ ঢাকা ভালো। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. 'আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ ইহরাম অবস্থায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকতাম আর আরোহীগণ আমাদের পাশ দিয়ে যেত। তারা যখন আমাদের বরাবর এসে যেত, তখন আমরা মাথা থেকে উড়না ঝুলিয়ে চেহারা আড়াল করতাম এবং যখন আমাদের পাশ দিয়ে চলে যেত তখন মুখ খুলে ফেলতাম।[৮] হাদীছটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে। এই হাদীছে বুঝা যায়, মুহরিম মহিলারা বেগানা পুরুষ না থাকলে মুখ খোলা রাখবে। আর বেগানা পুরুষ থাকলে মুখের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে মুখ ঢেকে রাখবে, তবে নিকাব বাঁধবে না।

উক্ত ৫টি নিষিদ্ধ কর্ম ঘটে গেলে করণীয় হচ্ছে, এ সময় এমন ব্যক্তির তিনটি অবস্থা হতে পারে- (১) না জেনে অথবা ভুলবশত এসব কর্মে লিপ্ত হলে অবগত হওয়ার সাথে সাথে অথবা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বর্জন করলে কাফফারা দিতে হবে না। (২) কোনো প্রয়োজন ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হলে গুনাগার হবে এবং ফিদিয়া দিতে হবে। (৩) বিশেষ প্রয়োজন বা সমস্যার কারণে করতে হলে গুনাহগার হবে না তবে ফিদিয়া দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ 'তোমাদের মাঝে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা মাথায় কোনো সমস্যার (কারণে নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হতে হলে) তাকে ফিদিয়াস্বরূপ ছিয়াম থাকতে হবে অথবা ফিদিয়া দিতে হবে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৬)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু মা'কিল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনু উজরার নিকট কূফার মসজিদে বসেছিলাম। তখন আমি তাকে ছিয়ামের ফিদিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হলো, তখন আমার মুখের উপর উকুন গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি তখন বললেন, সম্ভবত তোমার কষ্ট হচ্ছে? তুমি কি একটি ছাগল সংগ্রহ করতে পার? আমি বললাম না, তিনি বললেন, তুমি তিন দিন ছিয়াম পালন করো অথবা ছয় জন দরিদ্রকে খাদ্য দান করো এবং তোমার মাথার চুল ন্যাড়া করে ফেলো। তখন আমার ব্যাপারে বিশেষভাবে আয়াত অবতীর্ণ হয়। তবে তোমাদের সকলের জন্য এ হুকুম।[৯] এই হাদীছ প্রমাণ করে, একজন দরিদ্রকে অর্ধ ছা' সমান চাল বা গম দিতে হবে।

(৬) স্থলপ্রাণী শিকার করা : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ 'মুহরিম অবস্থায় তোমাদের জন্য স্থলপ্রাণী শিকার করা হারাম করা হয়েছে' *(আল-মায়েদা, ৫/১)*। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম অবস্থায় স্থলপ্রাণী শিকার করা যাবে না এবং শিকারে সহযোগিতা করা যাবে না। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করে, তাহলে তার কাফফারা হলো- আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণী হত্যা করবে, তার কাফফারা হলো অনুরূপ গৃহপালিত প্রাণী কা'বাতে কুরবানীর জন্য পাঠাতে হবে, যে ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ দুইজন লোক ফয়সালা করে দিবে কিংবা তার কাফফারা হলো কয়েকজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে অথবা তিন দিন ছিয়াম পালন করতে হবে। এটা নিজ কর্মের পরিণাম হিসাবে' *(আল-মায়েদা, ৫/৯৫)*। এই আয়াতে উল্লেখিত 'ইচ্ছাকৃতভাবে' শব্দ দ্বারা বুঝা যায়, ভুলবশত প্রাণী হত্যা করলে কাফফারা দিতে হবে না।

(৭) বিবাহ করা এবং বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া : ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা, বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া এবং কারো বিবাহে ঘটকালি

---

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৪১, ১৮৪২, ১৮৪৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩৭৮১।

৭. ছহীহ বুখারী, ১৮৩৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৯৩০; মিশকাত, হা/২৬৭৮।

৮. আবূ দাঊদ, ১৮৩৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪০৬৭; মিশকাত, হা/২৬৯০।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৪৫১৭।

করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করবে না। কারো বিবাহের ব্যবস্থা করবে না। এমনকি বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।[১০] যদি কেউ বিবাহ করে ফেলে, তাহলে সেই বিবাহ সঠিক হবে না।

(৮+৯) স্বামী-স্ত্রী মিলন ও মিলন ছাড়া যৌনতৃপ্তি মিটানো : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ 'হজ্জের জন্য রয়েছে নির্ধারিত কয়েকটি মাস। অতএব, যে ব্যক্তি ওই মাসসমূহে হজ্জ পালন করবে, সে যেন যৌনকর্ম, অশ্লীলতা, অবাধ্যতা ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত না হয় *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৭)*। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন ছাড়াও যৌনতৃপ্তি মিটানো নিষেধ। তবে এ অপরাধের কারণে হজ্জ-উমরার কিরূপ ক্ষতি হবে এবং কাফফারা কি অপরিহার্য হবে? এ সম্পর্কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হতে সরাসরি কোনো ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রসিদ্ধ ছাহাবীগণ হতে ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়, আমর ইবনে শুআইব নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন, 'এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের কাছে আসলেন এবং ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলন হলে কী করণীয় এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এক মুহরিম ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলনে লিপ্ত হয়েছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন, এঁর কাছে যান এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। শুআইব বলেন, সে তাঁকে চিনে না। তখন আমি লোকটিকে ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকটিকে বললেন, তোমার হজ্জ বাতিল হয়ে গেছে। লোকটি বলল, এখন আমি কী করতে পারি? ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি মানুষের সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকো এবং হাজীগণ যা করছেন, তা করতে থাকো এবং সামনের বছর বেঁচে থাকলে পুনরায় হজ্জ করো এবং কুরবানী করো। এরপর লোকটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে ফিরে গেল, তখন আমি তার সাথে ছিলাম। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করো। শুআইব বলেন, আমি তাকে নিয়ে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গেলাম। লোকটি ইবনু আব্বাস আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে জিজ্ঞেস করলেন। ইবনু আব্বাস আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর তাকে সেটাই বললেন, যা বলেছিলেন ইবনু উমার আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর। তারপর লোকটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে ফিরে গেলেন। সে সময় আমি তার সাথে ছিলাম। লোকটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা শুনালেন, তখন লোকটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে বললেন, আপনি এ ব্যাপারে কী বলছেন? তখন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তারা দুই জন যা বলেছেন, আমার সিদ্ধান্তও তাই।[১১]

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী মিলন ঘটলে- (১) হজ্জ বাতিল হবে (২) হাজীগণের সাথে হজ্জরত অবস্থায় থাকতে হবে (৩) পরের বছর হজ্জ পালন করতে হবে (৪) দম দিতে হবে।

(চলবে)

১০. ইবনু মাজাহ, হা/১৯৬৬।

১১. মুসতাদরাক হাকেম, হা/২৩৭৫।

- চাঁপাই ম্যাংগো সার্ভিস -
100% ফরমালিন মুক্ত চাঁপাই ম্যাংগো পরিসেবা

ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ক্ষিরসাপাত/ হিমসাগর, গোপাল-ভোগ, ল্যাংড়া, আমরুপালি, ফজলি সুরমা ফজলি, লক্ষণভোগ, আসিনা ইত্যাদি আম সরবরাহ করা হয়।

আমাদের আমের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

* 100% ফরমালিন মুক্ত আম।
* সরাসরি বাগান থেকে আম সংগ্রহ করা হয়।
* গাছে আম পাকা শুরু হবার পর থেকে সংগ্রহ করা হয়।
* প্রতিটি আম স্বাস্থ্যসম্মত পরিপক্ক।
* শতভাগ নিরাপদ আম।

প্রোপাঃ মোঃ আনোয়ার
কানসা, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
মোবাইল নং : ০১৭২২-৮৫৬৬৭০

ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(জানুয়ারি'২১ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-১৯)

পরকাল : পরকালের ইস্যুতে অন্যান্য মুসলিমের মতো মাতুরীদীরাও একই আক্বীদা পোষণ করে। কবরের আযাব বা শাস্তি, পুনরুত্থান, হাশর-নাশর, হিসাব-নিকাশ, দাঁড়িপাল্লা, পুলছিরাত, শাফাআত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে তারাও বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণ করেছে আল-হামদুলিল্লাহ।[১]

ছাহাবী ও ইমামত : ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারেও মাতুরীদীরা সঠিক আক্বীদা পোষণ করেছে। নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম-এর পরে সর্বোত্তম মানুষ ছাহাবায়ে কেরাম। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন, আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, তারপর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, তারপর উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তারপর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু। ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর মাঝে যেসব দাঙ্গা হয়েছিল, সেগুলো ছিল তাদের ইজতিহাদগত ভুলের কারণে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে এসব ক্ষেত্রে নিজের হাত ও যবানকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তাদের ব্যাপারে বাজে মন্তব্য করলে অবস্থা অনুযায়ী কখনো কুফরী, কখনো বিদ'আতী এবং কখনো ফাসেক্বী আচরণ হয়ে যাবে।[২]

এখানে ইমামত বলতে রাষ্ট্র পরিচালনা ও ছালাতের ইমামতি দুটিই উদ্দেশ্য। মুসলিমদের অবশ্যই একজন শাসক লাগবে, যিনি শরীআতের বিধিবিধান, দণ্ডবিধি কার্যকর করবেন। দেশরক্ষার কাজ করবেন। যাকাত উঠাবেন ও বণ্টন করবেন। দুষ্টের দমন করবেন। বিচার-ফয়সালা করবেন। সারা বিশ্বের একক খলীফা হলে তিনি কুরাইশ বংশ থেকে হবেন। তবে তারা মা'ছূম হওয়া শর্ত নয়। ফাসেক্বের পেছনেও ছালাত আদায় করা জায়েয। শাসক যালেম হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা জায়েয নেই। এসব ক্ষেত্রে মাতুরীদীরাও সঠিক আক্বীদা পোষণ করে থাকে।[৩] বুঝা গেল, ইমামতের ব্যাপারে তাদের আক্বীদা মোটামুটি ঠিক আছে।

বহুল প্রচলিত কিছু আক্বীদা, যেগুলো ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর আক্বীদা মনে করা হয়, অথচ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো :

প্রিয় পাঠক! এখানে আক্বীদাগত বেশকিছু ইস্যু নিয়ে কথা বলব, যেগুলো আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত আক্বীদা এবং এগুলোকে হানাফী আক্বীদা বলে মনে করা হয়। আর এই মনে করার পেছনে মৌলিক কারণ হলো, দল-মত নির্বিশেষে আমাদের দেশের বেশিরভাগ হানাফী ভাই-বোন এই আক্বীদা ধারণ ও লালন করে থাকেন। ফলে ব্যাপক অনুশীলনের কারণে জনগণের নিকট সেগুলো 'হানাফী আক্বীদা' বলে পরিচিতি পেয়েছে। কিন্তু আসলে কি ব্যাপারটা তাই? এই উত্তরটাই আমরা খোঁজার চেষ্টা করব নিচের আলোচনার মাধ্যমে।

(১) আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান :

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলিমের আক্বীদা-বিশ্বাস ও ঈমান হলো, মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। আরো দুঃখজনক হলো, বেশিরভাগ মানুষ এই আক্বীদাকে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর আক্বীদা বলে মনে করে। নিদেনপক্ষে এটা মনে করা হয় যে, এটা হানাফী আক্বীদা। অথচ ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ যেমন ছিলেন এই আক্বীদার সম্পূর্ণ উল্টো, তেমনি প্রকৃত হানাফী আক্বীদার সাথেও এর কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। চলুন, আমরা কুরআন, হাদীছ ও ইমামগণের বক্তব্যের আলোকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়টি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করি।

মহান আল্লাহ আসমানে আরশের উপর সমুন্নত। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ 'পরম দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন' *(ত্ব-হা, ২০/৫)*। পবিত্র কুরআনের নিচের আয়াতগুলোতেও মহান আল্লাহর আরশে আযীমে সমুন্নত হওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণিত— আল-আ'রাফ, ৭/৫৪; ইউনুস, ১০/৩; আর-রা'দ, ১৩/২; আল-ফুরক্বান, ২৫/৫৯; আস-সাজদাহ, ৩২/৪; আল-হাদীদ, ৫৭/৪।[৪]

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. উছূলুদ্দীন ইনদাল ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ৬০৮-৬১০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০।

৪. ত্ব-হা, ২০/৫; আল-আ'রাফ, ৭/৫৪; ইউনুস, ১০/৩; আর-রা'দ, ১৩/২; আল-ফুরক্বান, ২৫/৫৯; আস-সাজদাহ, ৩২/৪; আল-হাদীদ, ৫৭/৪; ছহীহ

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ - أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ ‘আর ফেরাউন বলল, হে হামান! তুমি আমার জন্য এক সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি করো, যাতে আমি আসমানে আরোহণের অবলম্বন পাই, যেন আমি দেখতে পাই মূসার ইলাহকে’ *(আল-মুমিন, ৪০/৩৬-৩৭)*।

নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীছ পেশ করা হলো :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ যখন মাখলূক্ব সৃষ্টি করলেন, তখন তার নিকটে আরশের উপর রক্ষিত কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন, নিশ্চয় আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে’।[৫]

মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

‘আমার একজন দাসী ছিল। উহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহ অঞ্চলে সে আমার ছাগল চরাতো। একদিন জানতে পারলাম, নেকড়ে একটি ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমি একজন সাধারণ আদম সন্তান হিসাবে রেগে যাই, যেভাবে তারা রেগে যায়। আমি তাকে একটা থাপ্পড় মারি। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আসলে তিনি একে আমার জন্য সাংঘাতিক কাজ বলে গণ্য করেন। ফলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে মুক্ত করে দিব না? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে তার কাছে নিয়ে আসলে তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তাকে তুমি মুক্ত করে দাও; কারণ সে মুমিন নারী’।[৬]

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ ‘যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অন্যান্য স্ত্রীর উপর গর্ব করে বলতেন, তোমাদের বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের পরিবার। আর আমার বিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে’।[৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ-তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বলেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দিব? কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?’[৮] আল্লাহ উপরে না থাকলে নিচে নেমে আসার কথা বলা হলো কেন?

অতএব, মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে তাঁর সৃষ্টির সাথে নেই। তবে তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দ্বারা তিনি তাঁর সৃষ্টির সাথে আছেন। এরশাদ হচ্ছে, ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ ‘যখন তারা দু’জন গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি তার সঙ্গীকে বলছিলেন, চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছে’ *(আত-তওবা, ৯/৪০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ ‘তুমি কি জানো না যে, যা আকাশে আছে আর যা যমীনে আছে আল্লাহ সব জানেন। তিন জনের মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থ জন আল্লাহ হন না, আর পাঁচ জনেও হয় না, ষষ্ঠ জন তিনি ছাড়া, এর কম

বুখারী, হা/২৯৬৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮২; ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃ. ১৩৫ -এরকম আরো অসংখ্য প্রমাণ আছে।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৬৭, ৬৯১৭, ৬৯৪৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭১৮।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮২।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬৯১৫।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/১০৭৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৪৫।

সংখ্যকেও হয় না আর বেশি সংখ্যকেও হয় না, তিনি তাদের সাথে থাকা ব্যতীত। তারা যেখানেই থাকুক না কেন' *(আল-মুজাদিলাহ, ৫৮/৭)*।

যুগে যুগে পূর্বসূরী আলেম-উলামাও ঠিক একথাই বলেছেন। চলুন, আমরা এখানে শুধু প্রসিদ্ধ চার ইমামের বক্তব্য দেখে আসি।

ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, مَنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ رَبِّيْ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ كَفَرَ، وَكَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَلَا أَدْرِي الْعَرْشَ أَفِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ 'যে ব্যক্তি বলে, আমার রব আসমানে না পৃথিবীতে, তা আমি জানি না, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বলে, তিনি আরশের উপর, কিন্তু আরশ আসমানে না যমীনে? তা আমি জানি না, তবে সেও অনুরূপ কাফের'।[৯]

প্রিয় দ্বীনী ভাই! দেখলেন তো, আপনার ইমামের আক্বীদা কী আর আপনার আক্বীদা কী! কতই-না ভালো হতো, যদি আপনি আপনার ইমামের আক্বীদাটা গ্রহণ করতেন! আচ্ছা, কারো আক্বীদা ভালো না লাগলে তার অনুসরণের দাবি করেন কী করে! সে যাহোক, এবার চলুন, বাকী তিন ইমামের আক্বীদা দেখে আসি।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, اللهُ فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ 'আল্লাহ আসমানে, কিন্তু তাঁর ইলম সর্বত্র। কোনো জায়গাই তাঁর ইলমের বাইরে নয়'।[১০] তিনি অন্যত্র বলেন, اللهُ فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ 'আল্লাহ আসমানে, কিন্তু তাঁর ইলম সর্বত্র। কোনো কিছুই তাঁর ইলমের বাইরে নয়'।[১১]

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الْقَوْلُ فِي السُّنَّةِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا الَّذِينَ رَأَيْتُهُمْ مِثْلَ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا إِقْرَارٌ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ فِي سَمَائِهِ يَقْرُبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ شَاءَ وَيَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كَيْفَ شَاءَ 'সুন্নাহ সম্পর্কে আমার ও আমি সুফিয়ান, মালেক প্রমুখের মতো যেসব আহলেহাদীছ বিদ্বানকে দেখেছি, তাদের বক্তব্য হলো, একথার সাক্ষ্য দিতে হবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ তাআলা আকাশে তাঁর আরশের উপর সমুন্নত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং যেভাবে ইচ্ছা নিচের আসমানে অবতরণ করেন'।[১২]

ইমামু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা সপ্তম আকাশের উপরে তাঁর আরশে সমুন্নত। তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞান সর্বত্র বিস্তৃত। তাই নয় কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, نَعَمْ هُوَ عَلَى عَرْشِهِ وَلَا يَخْلُو شَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ 'হ্যাঁ, তিনি আরশের উপর সমুন্নত এবং তাঁর ইলমের বাইরে কোনো কিছুই নেই'।[১৩]

ইমাম ইবনু খুযায়মা রাহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্য দিয়ে এ আলোচনাটি শেষ করতে চাই। তিনি বলেছেন, مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ اسْتَوَى فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ فَهُوَ كَافِرٌ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَأُلْقِيَ عَلَى مَزْبَلَةٍ لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِرَائِحَتِهِ أَهْلُ الْقِبْلَةِ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ 'যে ব্যক্তি স্বীকার করবে না যে, আল্লাহ সাত আসমানের উপর তাঁর আরশের উপর সমুন্নত, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, সে কাফের। তাকে তওবা করাতে হবে। তওবা করলে ভালো কথা। না করলে গর্দান নামিয়ে দিতে হবে এবং তারপর ভাগাড়ে নিক্ষেপ করতে হবে, যাতে তার দুর্গন্ধে ক্বিবলার অনুসারী মুসলিমরা এবং আহলুয যিম্মাহ অমুসলিমরা কষ্ট না পায়'।[১৪]

বিজ্ঞ পাঠক! তাহলে মহান আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান, না-কি আরশে? কোনটা সঠিক আপনারাই নির্ধারণ করুন

(চলবে)

৯. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃ. ১৩৫।
১০. আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আস-সুন্নাহ (দার ইবনিল ক্বাইয়িম, দাম্মাম, ১ম প্রকাশ : ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ.), ১/১৭৩।
১১. প্রাগুক্ত, ১/১৮০।
১২. ইবনু কুদামা, ইছবাতু ছিফাতিল 'উলু, (মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদীনা, ১ম প্রকাশ : ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খৃ.), পৃ. ১৮০। অবশ্য হাফেয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ এই বর্ণনাটিকে গ্রহণযোগ্য বলেননি; তবে মুহাদ্দিছ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনাটির ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি।
১৩. যাহাবী, আল-'উলু লিল-'আলিয়্যিল গফফার, (মাকতাবাত আযওয়াইস সালাফ, রিয়ায, ১ম প্রকাশ : ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ.), পৃ. ১৭৬।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া

*-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী**

ভূমিকা : প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর। মহান আল্লাহ মানবজাতি এবং জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য। তিনি সবার প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা রিযিক্বদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা ও পালনকর্তা। তিনি সবার উপর করুণা করেন। তাই তো তাঁর করুণার শুকরিয়া আদায় আমাদের করতে হবে। কারণ, মানবজাতি একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সূরা আন-নাবা মহাপ্রলয় সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহ মানবজাতির চলাফেরার জন্য যমীনকে করেছেন সমতল তথা বিছানাস্বরূপ, যাতে তাদের কোনো সমস্যা না হয়। এতে সৃষ্টি করেছেন পাহাড় এবং একে মযবূত করেছেন, যাতে ভেঙ্গে না যায়। মানবতার কল্যাণের জন্য তাদেরকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, যাতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে কল্যাণকর জীবনযাপন করতে পারে। তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত্র, যাতে তারা ঘুমিয়ে ক্লান্তি দূর করতে পারে এবং আরাম-আয়েশ জীবনযাপন করতে পারে। তাদের জন্য দিনের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তারা রূযী-রোযগার উপার্জন করে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারে। তাদের জন্য আসমানকে বানিয়েছেন মযবূত। আর আসমান থেকে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে মানুষ চাষাবাদ করে শস্য ও ফলাদি উৎপাদন করতে পাবে এবং জীবজন্তুকে পান করতে পারে। এভাবেই তাঁর অবদানের কথা মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ একদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে, সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। বিধায়, হে বস্তুবাদীরা! মৃত্যুকে স্মরণ করো, সঠিক পথে ফিরে এসো, মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

সূরা আন-নাবার হাদিয়াসমূহ নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

১. কিয়ামত হবেই হবে : সূরা আন-নাবা মানবজাতিকে সংবাদ দিচ্ছে, কিয়ামত হবেই হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ - عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ - الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ - كَلَّا سَيَعْلَمُونَ - ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ 'এরা পরস্পর কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে? তাদের জিজ্ঞাসা মহাপ্রলয় সম্পর্কে, যে বিষয়ে তারা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করে। অচিরেই তারা সে বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। অতঃপর অবশ্যই তারা অচিরেই সে বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে' *(আন-নাবা, ৭৮/১-৫)*। যারা আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহ এবং পরকালকে অস্বীকার করে, তারাই কিয়ামত সম্পর্কে মতবিরোধ করে। অথচ কিয়ামত যে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপরও তারা তাতে অবিশ্বাস করে, যে পর্যন্ত না সরাসরি শাস্তি দেখে অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করে।[১]

বর্তমানে মানুষ ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দুনিয়ার উপর্জন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে। হঠাৎ একদিন সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ - حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ - ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ - كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ - لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ - ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ - ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে; যে পর্যন্ত না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটি সঙ্গত নয়, শীঘ্রই তোমরা তা জানতে পারবে। আবার বলি, এটি সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে। সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না। অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে। তোমরা এটা চাক্ষুষ প্রত্যয়ে দেখবে। এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(আত-তাকাছুর, ১০২/১-৮)*। বর্তমানে মানুষ অন্যায় কাজের প্রতিযোগিতা লিপ্ত আছে, কীভাবে মানুষকে ঠকানো যায়, অন্যায় পথে ধন-সম্পদ উপার্জন করা যায়, অন্যের জমি দখল করে নেওয়া যায়, নেতা সেজে অন্যায়ভাবে অন্যকে হত্যা করা যায়; টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, গাড়ি-বাড়ি, ছেলে-মেয়ে নিয়ে কীভাবে অহংকার করা যায়, প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে কী করে মানুষকে বঞ্চিত-অপমানিত করা যায়— এসব নিয়ে ব্যস্ত, তখনই হঠাৎ মালাকুল মাউত উপস্থিত হয়ে তার রূহ ক্বয করে নিয়ে যান। এভাবেই হঠাৎ তাকে পরপারের জীবনে স্থানান্তরিত হতে হয়। এজন্যই পরকালকে বিশ্বাস এবং মৃত্যুকে স্মরণ করে আমলে ছালেহ করতে হবে; নচেৎ নাজাত মিলবে না।

অতএব, হে মানবজাতি! পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে আমলে ছালেহ-এর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও; নচেৎ নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, অকৃতজ্ঞদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। হে আদমসন্তান! তোমাকে যে গাড়ি, বাড়ি, অঢেল সম্পদ, জমি-জায়গা ইত্যাদি

* এম. এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. তাফসীর আস-সা'দী, পৃ. ৯০৬।

নিয়ামত দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তুমি আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করো। কীভাবে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছ এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছ ইত্যাদি সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমার জাহান্নামে প্রবেশ করা সম্পর্কে যখন নিশ্চিতভাবে জানবে এমনকি স্বচক্ষে দেখবে, তখনই তোমার হুঁশ হবে, এর আগে নয়, তাই তো? হে মানবমণ্ডলী! তোমার অহংকার করার কিছুই নেই। সুতরাং কালবিলম্ব না করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসো, তওবা করে ঈমানের উপর অটল থাকতে চেষ্টা করো। হে দুনিয়াসক্ত পথিক! আর কতদিন দুনিয়ার প্রতি মোহাগ্রস্ত থাকবে? কত সময় অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকবে? এবার সময় হয়েছে তোমার মনকে অন্যায় থেকে থামিয়ে দাও। হে যুবসমাজ! অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখো; নচেৎ পরকালের ভয়াবহতা থেকে রেহাই পাবে না। হে দেশের নেতৃবর্গ! নিজের, মানবতার, মুসলিমজাতির এবং দেশবাসী সকলের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করো; নচেৎ মুক্তির কোনো উপায় পাবে না। ফেরাউনের কথা একবার স্মরণ করো। সে যাবতীয় অন্যায়ে এমনভাবে লিপ্ত ছিল যে, নিজেকে প্রভু দাবি করত পিছপা করেনি। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন, ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ 'অতঃপর সে বলল, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক' *(আন-নাযিআত, ৭৯/২৪)*।

হে মানবমণ্ডলী! হে নেতৃবর্গ! মূসা আলাইহিস সালাম এবং ফেরাউনের ইতিহাস খুব বেশি স্মরণ করো, যখন মূসা ও তার অনুসারীদের মহান আল্লাহ বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন আর ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। মাহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ - فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ 'আর আমি বনূ ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম। অতঃপর সীমালঙ্ঘন ও অত্যাচারের বশবর্তী হয়ে ফেরাউন ও তার সৈন্যদল বনী ইসরাঈলদের পশ্চাদ্ধাবন করল, এমনকি যখন জলমগ্ন হওয়ার উপক্রম হলো, তখন সে বলল, আমি বিশ্বাস স্থাপন (ঈমান আনলাম) করলাম যে, তিনি ব্যতীত কোনো সত্য মাবূদ নেই যার প্রতি বনূ ইসলাঈল ঈমান এনেছিল, আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হলাম। (আল্লাহ বললেন,) তুমি এখন ঈমান আনছ? অথচ ইতোপূর্বে অবাধ্যাচরণ করেছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতএব, আমি আজ বাঁচিয়ে দিচ্ছি তোমার দেহকে, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্যে উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাকো। আর প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ মানুষেই আমার উপদেশাবলি হতে উদাসীন থাকে' *(ইউনুস, ১০/৯০-৯২)*।

হে মানবজাতি! কারুনের কথা স্মরণ করো। মহান আল্লাহ কারুণ সম্পর্কে বলেন, ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ 'কারুন ছিল মূসা আলাইহিস সালাম -এর সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল। আমি তাকে এমন ধনভান্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। (স্মরণ করো, যখন) তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৭৬)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন, তার দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান করো, আর দুনিয়ায় তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে প্রয়াসী না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। সে বলল, আমি এই সম্পদ আমার নিজস্ব জ্ঞানগরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানত না যে, আল্লাহ তাআলা তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? অপরাধীদেরকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। (তারা বিনা হিসাবেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে)। অতঃপর কারুন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়! কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হতো! প্রকৃতপক্ষে সে মহাভাগ্যবান। আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক! তোমাদেরকে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া ছওয়াবই উৎকৃষ্ট। ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পায় না। অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না। গতকাল যারা তার মতো হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যুষে বলতে লাগল, দেখলে তো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক্ব বর্ধিত করেন ও হ্রাস করেন। আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। দেখলে তো! কাফেররা সফলকাম হবে না। এটা আখেরাতের আবাস, যা আমি নির্ধারণ করি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৭৭-৮৩)*।

(চলবে)

ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা

মূল : আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ
*অনুবাদ : আব্দুর রহমান বিন লুতফুল হক ভারতী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যারা শুধু কুরআনের অনুসরণই যথেষ্ট মনে করে, তাদের ভ্রষ্টতা : দুঃখের বিষয় হলো, এক শ্রেণির মুফাসসির এবং বর্তমান যুগের কিছু লেখক তারা শুধু কুরআনের উপর ভরসা করে হিংস্র জন্তুর গোশত খাওয়া এবং স্বর্ণ ও রেশম পরিধান করা বৈধ মনে করে! শুধু তাই নয়, বরং বর্তমান যুগে একটি নতুন দলের আবির্ভাব হয়, যারা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বলে দাবি করে। তারা ছহীহ হাদীছের সাহায্য না নিয়েই ইচ্ছামতো কুরআনের ব্যাখ্যা করে থাকে। সুন্নাহর ব্যাপারে তারা তাদের প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীকেই বিচারক বানিয়ে নিয়েছে। কোনো হাদীছ মনঃপূত হলে তা গ্রহণ করে এবং কোনো হাদীছ নিজের মর্জি-বিরুদ্ধ পেলে তা প্রত্যাখ্যান করে। সম্ভবত নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছহীহ হাদীছে এদের ব্যাপারেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তিনি বলেন, 'আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদীতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, তার নিকট আমার কোনো আদেশ বা নিষেধ পৌঁছলে সে বলবে, আমি এসব কিছু জানি না। আমরা যা আল্লাহর কিতাবে পাব, শুধু তারই অনুসরণ করব'। এটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন।[১] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'আমরা কুরআনে যা হারাম পাব, তা মেনে নিব। জেনে রেখো! আমাকে কুরআন এবং তার সাথে তার মতো আরো একটি জিনিস দেয়া হয়েছে'।[২] অন্য আরেকটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে, 'জেনে রেখো, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কিছু বস্তু হারাম করেছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন'।[৩]

দুঃখের বিষয় যে, একজন সম্মানিত লেখক শরীআতের আহকাম ও ইসলামী আক্বীদা বিষয়ে বই লেখেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় উল্লেখ করেন, তাঁর এ গ্রন্থের তথ্যসূত্র শুধু কুরআন ছিল!

উক্ত ছহীহ হাদীছটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামী শরীআত শুধু কুরআন অনুসরণ করার নাম নয়, বরং কুরআন ও হাদীছ উভয়টাকেই অনুসরণ করার নাম হচ্ছে ইসলাম। অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনোটিকেই বাদ দেওয়া যাবে না। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ দুটোই একে অপরকে আঁকড়ে ধরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল' *(আন-নিসা, ৪/৮০)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ 'আপনার রবের শপথ, তারা মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদীয় বিষয়সমূহে আপনাকেই একমাত্র সমাধানকারী গ্রহণ না করবে। অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়' *(আন-নিসা, ৪/৬৫)*। তিনি আরো বলেন, ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ 'কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফয়সালা দিলে সে বিষয়ে তাদের নিজে ফয়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, সে সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ হবে' *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৬)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ 'রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তোমরা তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, তোমরা তা পরিত্যাগ করো' *(আল-হাশর, ৫৯/৭)*। এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে প্রমাণিত বর্ণনাটি পেশ করা খুবই উপযুক্ত মনে হচ্ছে। বর্ণনাটি হচ্ছে, জনৈকা মহিলা ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে বললেন, আপনি নাকি বলেন, যে সমস্ত নারীরা শরীরে উল্কি অঙ্কন করে এবং যারা উল্কি অঙ্কন করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভুরু-চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, এদের সবাইকে আল্লাহ লা'নত করেছেন? ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, আমি কেন তার উপর অভিশাপ করব না, যাকে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন? অথচ তা আল্লাহর কিতাবে রয়েছে। অতঃপর মহিলাটি বললেন, আমি কুরআন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি, কিন্তু কোথাও তো একথা পাইনি। তিনি বললেন, তুমি

* পিএইচডি গবেষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৫; তিরমিযী, হা/২৬৬৩; ইবনু মাজাহ, হা/১৩, মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৮৭৬, এ সনদের সকল বর্ণনাকারী ছিক্বাহ ও নির্ভরযোগ্য এবং এরা সকলেই ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী, হাদীছটিকে আলবানী ছহীহুল জামে' (হা/৭১৭২) গ্রন্থে ছহীহ বলেছেন।

২. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭১৭৪।

৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭১৯৪; ইবনু মাজাহ, হা/১২।

(ভালোভাবে) পড়লে অবশ্যই তা পেয়ে যেতে। তুমি কি এ আয়াতটি পড়োনি, 'রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, তোমরা তা পরিত্যাগ করো'।[৪]

কুরআন বুঝার জন্য শুধু আরবী ভাষা যথেষ্ট নয় : উপরে উল্লেখিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে আমাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোনো ব্যক্তি আরবী ভাষায় যতই পারদর্শী হোক না কেন, হাদীছের ব্যাখ্যা ব্যতীত তার জন্য কুরআন বুঝা কোনো মতেই সম্ভব নয়। কেননা, সে আরবী ভাষায় যতই দক্ষতা রাখুক না কেন, ছাহাবীগণের চেয়ে আরবী ভাষায় বেশি দক্ষ হতে পারে না। কারণ কুরআন তাঁদেরই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তখন পর্যন্ত আরবী ভাষায় অনারবদের মিশ্রণ ঘটেনি। তা সত্ত্বেও তাঁরা যখন শুধু ভাষার উপর নির্ভর করে উপরে উল্লেখিত আয়াতের অর্থ বুঝতে চেয়েছিলেন, তাঁদের দ্বারাও ভুল হয়েছিল।

তাই এটাই প্রকৃত সত্য, যে ব্যক্তি হাদীছশাস্ত্রে যত গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবে, সে ব্যক্তি কুরআনের অর্থ বুঝতে এবং তা হতে মাসআলা-মাসায়েল বের করতে বেশি দক্ষ হবে ঐ ব্যক্তির অপেক্ষায়, যে মোটেই সুন্নাহর জ্ঞান রাখে না। তাহলে ভেবে দেখুন! যে ব্যক্তি আগাগোড়া সুন্নাহ অস্বীকার করে তার কী অবস্থা হতে পারে? তাই আহলে ইলমের নিকট কুরআন সঠিকভাবে বুঝার সর্বস্বীকৃত নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি হচ্ছে, **কুরআনের তাফসীর প্রথমত কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে করতে হবে। তারপর ছাহাবীগণের বক্তব্যের মাধ্যমে করতে হবে।**

এখান থেকে আমদের নিকট স্পষ্ট হয় যে, অতীত ও বর্তমান যুগের আহলে কালামদের ভ্রান্তি এবং আক্বীদা ও আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের সালাফগণের বিরোধিতার মূল কারণ হচ্ছে, সুন্নাহকে অগ্রাহ্য করা এবং ছিফাত ও অন্যান্য বিষয়ের আয়াতসমূহের নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী অর্থ নির্ধারণ করা। এ মর্মে 'শারহুল আক্বীদা আত-ত্বহাবিয়্যাহ'-তে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, তা কতই না সুন্দর! এ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের ২১২ পৃষ্ঠায় এসেছে, 'আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ থেকে যারা দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে না, তারা কিভাবে দ্বীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে কথা বলে? তারা কেবল অমুক অমুকের কাছ থেকেই দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে থাকে। তারা কুরআনকে জ্ঞান অর্জনের উৎস মনে করলেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ থেকে তারা উহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করে না এবং তাতে দৃষ্টিও নিক্ষেপ করে না। এমনকি মুহাদ্দিছগণের দ্বারা চয়নকৃত নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে ছাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসরণকারী তাবেঈদের থেকে যে বর্ণনা এসেছে, তাতেও দৃষ্টিপাত করে না। কারণ এই ছাহাবী ও তাবেঈগণ শুধু কুরআনের শব্দ বর্ণনা করেননি, বরং তাঁরা শব্দ ও অর্থ উভয়ই বর্ণনা করেছেন। শিশুরা যেভাবে কুরআন শিখে তাঁরা সেভাবে কুরআন শিখতেন না, বরং তাঁরা অর্থসহ কুরআন শিখতেন। যে ব্যক্তি ছাহাবীদের পথ অবলম্বন করবে না, সে কুরআনের মনগড়া তাফসীর করবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন না করেই নিজের মনগড়া কথা বলবে এবং তাকে দ্বীনের অংশ মনে করবে, তার কথা সঠিক হলেও সে গুনাহগার হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে, তার কথা ভুল হলেও সে নেকী পাবে। তবে এ ব্যক্তির কথা যদি সঠিক হয়, তাহলে তার নেকী বহুগুণ বৃদ্ধি করা হবে'।

অতঃপর ইমাম ইবনু আবিল ইয বলেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো, সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহর সামনে নিজেকে সোপর্দ করবে, তার আদেশের সামনে মাথা নত করবে এবং তাঁর সংবাদকে সত্য বলে মেনে নিবে। আমাদের জন্য কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয় যে, ভ্রান্ত কল্পনার মাধ্যমে আমরা তাঁর বিরোধিতা করব। ভ্রান্ত কল্পনাকে বিবেক-বুদ্ধির দলীল নাম দিয়ে তাকে শরীআতের দলীলের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো বৈধ নয়। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের ব্যাখ্যা করা আমাদের জন্য বৈধ নয় কিংবা কুরআন-সুন্নাহর দলীলের উপর মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া এবং মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদকে শরীআতের অকাট্য দলীলের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া আমাদের জন্য মোটেই সমীচীন নয়। সুতরাং একমাত্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কেই ফয়সালাকারী হিসেবে মানবো এবং একমাত্র তাঁর সুন্নাতের সামনেই নিজেদেরকে সোপর্দ করব, যেভাবে আমরা রাসূল প্রেরণকারী আল্লাহর ইবাদত করে থাকি, তার জন্য নত হই, বিনীত হই, তার দিকেই ফিরে যায় এবং তার উপরই ভরসা করি'।

মোটকথা, আমল করার ক্ষেত্রে এবং শরীআতের সকল বিধান পালনের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। এ দুটোরই অনুসরণ মানুষকে বিভিন্ন পথ অনুসরণ করা এবং পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার গ্যারান্টি দেয়।

বলা বাহুল্য যে, আমরা এখানে যে সুন্নাহর মর্যাদার কথা উল্লেখ করছি, তা হচ্ছে সেই সুন্নাহ, যা রিজাল ও ই'লাল শাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছগণের নিকট নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী দ্বারা ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত। সেই সুন্নাহ বা হাদীছগুলো নয়, যেগুলো তাফসীর, ফিক্বহ ও আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। কেননা এই গ্রন্থগুলোতে অনেক দুর্বল, জাল ও ভিত্তিহীন হাদীছ থাকে, যেগুলোর সাথে ইসলামের কোনো

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৫।

সম্পর্কই নেই। যেমন হারূত-মারূতের হাদীছ, গারানীক্বের হাদীছ। গারানীক্বের ঘটনা সম্পর্কে আমার একটি পুস্তিকা রয়েছে, যেখানে আমি হাদীছটিকে বাতিল প্রমাণ করেছি।

‘সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যঈফা ওয়াল মাউযূআ’ নামক আমার বিশাল গ্রন্থে এই শ্রেণির বহু হাদীছ সংকলন করেছি। যার সংখ্যা এখন পর্যন্ত চার হাজার হাদীছ পৌঁছে গেছে। যেখানে দুর্বল ও জাল উভয় ধরনের হাদীছ রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত শুধু পাঁচশত হাদীছই ছাপানো হয়েছে!

আলেমদের জন্য, বিশেষ করে যারা মানুষের মাঝে দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েল ও ফাতাওয়া প্রচার করেন, তাদের জন্য এটা জরুরী যে, কোনো হাদীছ থেকে মাসআলা-মাসায়েল বের করার আগে তা যাচাই-বাছাই করে নেওয়া, হাদীছটি ছহীহ না-কি যঈফ। কেননা ফিক্বহের গ্রন্থগুলো, যেগুলো মানুষ বেশি বেশি অধ্যয়ন করেন- বাতিল ও ভিত্তিহীন হাদীছে পরিপূর্ণ- যেমনটা আলেমদের নিকট সুপরিচিত বিষয়। আমি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করা আরম্ভ করেছিলাম, যেটা ফিক্বহের ছাত্রদের জন্য খুবই উপকারী হত বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো। গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলাম, اَلْأَحَادِيْثُ الضَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ فِيْ أُمَّهَاتِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ ফিক্বহের যে গ্রন্থগুলো আমার এ গ্রন্থে শামিল ছিল তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. হানাফী মাযহাবের গ্রন্থ ‘আল-হেদায়া’। লেখক- আল মারগীনানি।

২. মালেকী মাযহাবের গ্রন্থ ‘আল-মুদাওওয়ানা’। লেখক- ইবনুল কাসেম।

৩. শাফেঈ মাযহাবের ‘শারহুল ওয়াজীয’। লেখক- রাফেঈ।

৪. হাম্বালী মাযহাবের ‘আল-মুগনী’। লেখক- ইবনু কুদামা।

৫. তুলনামূলক ফিক্বহ শাস্ত্রের মধ্যে ইবনু রুশদ আল আন্দালুসীর ‘বিদায়াতুল মুজতাহিদ’।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই যে, গ্রন্থটি সম্পন্ন করার সুযোগ পাইনি। কেননা কুয়েতের الوعي الإسلامي নামক যে পত্রিকাটি আমার এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো ছাপানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ও আমার এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিল, সে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। যদিও এ কাজটি সম্পন্ন করা হয়নি, তবে অন্য কোনো সুযোগে *ইনশাআল্লাহ* ফিক্বহ শাস্ত্রের জ্ঞানপিপাসুদের উদ্দেশ্যে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম মূলনীতি তৈরি করব, যা তাদের জন্য উপকারী হবে এবং হাদীছের উৎসগ্রন্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করে হাদীছের মান জানার পদ্ধতি তাদের জন্য খুব সহজ করে তুলবে। আল্লাহ যেন আমাকে এ কাজের তাওফীক্ব দান করেন।

রায়-ইজতিহাদ সম্পর্কে বর্ণিত মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীছটি দুর্বল ও মুনকার : আলোচনা শেষ করার পূর্বে একটি খুবই প্রসিদ্ধ হাদীছের দিকে সম্মানিত উপস্থিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। উছূলে ফিক্বহের এমন কোনো গ্রন্থ নেই, যেখানে হাদীছটি উল্লেখ করা হয়নি। হাদীছটি এখানে আলোচনা করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, হাদীছের সনদটি দুর্বল। অতঃপর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, শরীআতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না এবং দুটোর উপর একসাথে আমল করা জরুরী। আর হাদীছটি সেই সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক।

সেই হাদীছটি হচ্ছে, মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীছ। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ইয়ামানে পাঠাতে মনস্থ করলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কীভাবে বিচার করবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিচার করব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা যদি আল্লাহর কিতাবে না পাও? মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ দ্বারা ফয়সালা করব। রাসূলুল্লাহ বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহতে না পাও? এর উত্তরে তিনি বললেন, তাহলে আমি আমার বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করব এবং তাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করব না। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সমস্ত প্রশংসা একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধিকে সেই জিনিসের তাওফীক্ব দান করেছেন, যে ব্যাপারে তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট’।[৫]

সনদের দিক দিয়ে যে এটি দুর্বল, তা বিস্তারিত আলোচনা করার এখানে সুযোগ নেই। ‘সিলসিলাতুয যঈফা’-তে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এতটুকুই বলা যথেষ্ট হবে, আমীরুল মুমিনীন ইমাম বুখারী মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু–এর উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, ‘এ হাদীছটি মুনকার’।

এখন হাদীছটি পরস্পর বিরোধী কেন? এর বিস্তারিত আলোচনা করব।

মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এ হাদীছটিতে বিচারকের জন্য তিনটি পর্যায় নির্ধারণ করা হয়েছে। রায় ও বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা তখনই ফয়সালা করা যাবে, যখন তা সুন্নাহতে পাওয়া যাবে না।

[প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৮ নং পৃষ্ঠায়]

৫. মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০০৭; আবূ দাঊদ, হা/৩৫৯২; তিরমিযী, হা/১৩২৭।

www.al-itisam.com

আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব

মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
*অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**

(এপ্রিল’২১ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)
(পর্ব-৬)

ভুল ধারণা-৬ : আহলেহাদীছগণ আলেমদের মান্য করেন না :

আহলেহাদীছগণ তাক্বলীদে শাখছী (ব্যক্তির অন্ধানুসরণ) করা থেকে বিরত থাকে। এটাকে অনেকেই তাদের আলেমবিমুখতা হিসাবে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। তারা মনে করে থাকে যে, আহলেহাদীছরা যখন চার ইমামকে অমান্য করে তাহলে তারা অন্য আলেমদের মানবে কোন দুঃখে? তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতাবিবর্জিত। আহলেহাদীছগণ কোনো আলেমের ব্যক্তিগত মতামতকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মতো মান্য করা আবশ্যক মনে করেন না। তথাপি তারা আলেমদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। দ্বীনের কোনো বিষয় বুঝার জন্য আলেমদের নিকট হতে সমাধান খোঁজেন এবং তাদের থেকে সুপরামর্শ নেওয়াকে আবশ্যক মনে করেন।

১. আহলেহাদীছগণ অজানা বিষয়সমূহ আহলে ইলমদের থেকে জেনে থাকেন : মহান আল্লাহ নিজেই অজানা বিষয় আলেমদের থেকে জেনে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ‘যদি তোমার জানা না থাকে তাহলে জ্ঞানীদের (আহলে ইলমদের)-কে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও’ *(আন-নাহল, ১৬/৪৩; আল-আম্বিয়া, ২১/৭)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা আলেমগণ দলীল পেশ করে থাকেন যে, যার জ্ঞান নেই সে জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞেস করে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে।

২. আলেমদের বিদায় মানুষের পথভ্রষ্টতার বড় একটি কারণ : আলেমগণ বেঁচে থাকা উম্মাহর ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার বড় একটি মাধ্যম। আর আলেমদের মৃত্যু ভ্রষ্টতা এবং ধ্বংসের মাঝে নিপতিত হওয়ার একটি বড় কারণ। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ.

‘আল্লাহ তোমাদের যে ইলম দান করেছেন, তা হঠাৎ ছিনিয়ে নেবেন না বরং আলেমদের তাদের ইলমসহ ক্রমশ তুলে নেওয়ার মাধ্যমে তা ছিনিয়ে নেবেন। তখন কেবল মূর্খ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের কাছে ফতওয়া চাওয়া হবে, তখন তারা মনগড়া ফতওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে’।[১]

উল্লিখিত হাদীছের উপর ভিত্তি করে আহলেহাদীছগণ এই বিশ্বাস রাখেন যে, আলেমদের উপস্থিতি উম্মতের জন্য কল্যাণ ও হেদায়াতের মাধ্যম। যোগ্য আলেমের অনুপস্থিতির কারণে ফতওয়াদানে অযোগ্য ব্যক্তি ফতওয়া দেওয়ার সুযোগ পায়। যার ফলে সে নিজে পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদের পথভ্রষ্ট হওয়ার মাধ্যম হয়। এজন্যই সর্বদা আলেমদের সাথে সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন।

৩. আহলেহাদীছগণ নিজেরাই কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার নিন্দা করে থাকেন:[২] অনেক মানুষের ভুল ধারণা রয়েছে যে, আহলেহাদীছদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং আলেমদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করা এবং প্রবৃত্তিপূজারী বানানো। সম্ভবত এই সংশয় পোষণকারীদের মাঝে এমন কেউ রয়েছে যে জানে না যে, আহলেহাদীছদের মাঝে যেমন আলেম রয়েছে তেমন সাধারণ মানুষও রয়েছে, যারা আলেমদের থেকে দ্বীনের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আহলেহাদীছদের বড় বড় দ্বীনী মাদরাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেখান থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র সনদ (সার্টিফিকেট) গ্রহণ করে দ্বীনের খেদমতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আহলেহাদীছদের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে এটা নয় যে, সাধারণ মানুষকে আলেমদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাদের

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩০৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮২৮, ৪৮২৯ ‘বুখারীর শব্দ।

২. বিচারক তিন প্রকার : দুই প্রকারের বিচারক জাহান্নামী এবং এক প্রকারের বিচারক জান্নাতী। (১) যে বিচারক প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিচার করবে সে জাহান্নামী (২) যে বিচারক তদন্ত ছাড়া বিচার করবে সে জাহান্নামী (৩) যে বিচারক সত্য তথ্য জেনে বিচার করবে সে জান্নাতী *(ত্বাবারানী, ইবনু উমার বর্ণনা করেন; ছহীহুল জামে‘, হা/৪৪৪৭, হাদীছ ছহীহ)*।

মুজতাহিদের আসনে বসিয়ে দেওয়া। বরং আহলেহাদীছদের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে ওই জ্ঞানের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, যে জ্ঞান রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হতে নিয়ে এসেছিলেন অর্থাৎ অহীর জ্ঞান। আহলেহাদীছদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাধারণ মানুষদের মাযহাবী গোঁড়ামি থেকে বের করে চূড়ান্ত সত্যকে গ্রহণ করার ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া। তাতে সত্য উপস্থাপনকারী বিরোধী পক্ষ হোক না কেন! আহলেহাদীছদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, উম্মাতে মুসলিমা যেন বাপ-দাদা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ এবং কুপ্রবৃত্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বক্তব্যকে গ্রহণ করে। বরং ভালোভাবে লক্ষ করলে বুঝা যায়, কুপ্রবৃত্তির পূজা তো হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথাকে সাদরে গ্রহণ করার পরিবর্তে বাপ-দাদা, সমাজ এবং মাযহাবী গোঁড়ামির উপর গোঁ ধরে বসে থাকা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

‘অতঃপর (হে নবী) তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?’ *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৫০)*।

অর্থাৎ মানুষ যদি রাসূলের ডাকে সাড়া না দেয়, তাঁর কথাকে মান্য না করে, এমনকি শুনতেও না চায় তাহলে তারা যে কুপ্রবৃত্তির পূজারী হওয়ার জন্য উল্লিখিত আয়াতই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়াত এবং পথের দিশা প্রত্যাখ্যান করে শুধু ধারণা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করাই সবচেয়ে বড় ভ্রষ্টতা। যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়াতের বিরোধিতা করবে, তার সত্যের পথ হতে বিচ্যুত হওয়া এবং অভীষ্ট লক্ষ্য হতে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে কি?

আহলেহাদীছদের মতে যেমন আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ভ্রষ্টতার কারণ, ঠিক তেমন আলেমদের ফতওয়াসমূহের মধ্য থেকে নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী ফতওয়া খোঁজা এবং সে অনুযায়ী আমল করাও ভ্রষ্টতা। এমন ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে আলেমদের কথার প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারী মনে হলেও মূলত তারা নিজের নফসের গোলাম।

সুলায়মান আত-তায়মী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, إِنْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ اجْتَمَعَ فِيْكَ الشَّرُّ كُلُّهُ ‘যদি তুমি প্রত্যেক আলেমের সহজ ফতওয়াগুলো গ্রহণ কর, তাহলে তোমার ভেতরে সকল মন্দ একত্রিত হয়ে যাবে’।[৩]

ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, هَذَا إِجْمَاعٌ لَا أَعْلَمُ فِيْهِ خِلَافًا ‘উক্ত কথার উপর ঐকমত্য সাব্যস্ত হয়েছে। উক্ত কথায় কেউ মতানৈক্য করেছে আমি জানি না’।[৪] নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য আলেমদের বক্তব্যের সহযোগিতা নেওয়া জ্ঞানের বিপরীতে মূর্খতা ও কল্যাণের বিপরীতে অকল্যাণ গ্রহণের সদৃশ। সুতরাং আহলেহাদীছদের দাওয়াত হচ্ছে, সকল প্রকারের প্রবৃত্তির পূজা থেকে বাঁচার দাওয়াত। কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার দাওয়াত।

৪. মতপার্থক্যের সমাধান কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকেই হওয়া উচিত : এখানে গভীর চিন্তার বিষয় হচ্ছে, যারা আলেমদের কথা মান্য করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে থাকে এবং আহলেহাদীছদেরকে আলেমদের দুশমন প্রমাণিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, তারা কি সকল আলেমদের বক্তব্য মেনে থাকেন? এক মাসলাক বা মতের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় তাদের মাঝেই দুইটি দলের মাঝে এমন মারাত্মক মতবিরোধ হয়ে থাকে যে, তাদের এক দল আরেক দলকে পথভ্রষ্ট এমনকি কাফের পর্যন্ত বলে থাকে। এমতাবস্থায় এক দলের আলেমগণ তাদের অনুসারীদের অন্য দলের আলেমদের থেকে দূরে রাখে। (আফসোস!) কিন্তু তারা তাদের এই কর্মকে আলেমদের অসম্মান বা বিরোধিতা মনে করে না। তাদের মতে আলেমদের বক্তব্যকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে, শুধু নিজ দলের আলেমদের মান্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণ কোনো আলেমের বক্তব্য শুধু দলীয় গোঁড়ামির উপর ভিত্তি করে প্রত্যাখ্যান করেন না, বরং কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হলে বা দলীল না থাকলে প্রত্যাখ্যান করেন এবং এমনটি করা সরাসরি ঈমানের দাবি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

৩. জামেউ বায়ানিল ইলম, পৃ. ১০৮৯।

৪. প্রাগুক্ত।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার নেতৃবর্গের (আলেমদের) আনুগত্য করো। আর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হলো উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে প্রকৃষ্টতর’ *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে অনেক আলেম এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, আলেমদের বক্তব্য মান্য করা আবশ্যক। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এটার আদেশ করেছেন। কিন্তু তারা মানুষকে একথা বলে না যে, এই আয়াতে আল্লাহ উলূল আমর (আলেমদের) কথা মান্য করার পূর্বে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করার আদেশ স্বতন্ত্রভাবে প্রদান করছেন। আলেমদের কথা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার উপর প্রাধান্য পাবে? আলেমগণ কি কুরআন-সুন্নাহর চেয়েও বড়? উক্ত আয়াতে আলেমদের সত্তাগতভাবে দলীল হিসাবে স্বীকৃত দেওয়া হয়নি, বরং মতবিরোধের সময় কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে সমাধান দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। যদি আলেমদের বক্তব্য মৌলিক দলীল হতো, তাহলে আলেমদের বক্তব্যকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরানোর প্রয়োজন হতো না। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, আলেমদের বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হলে তা মানতে হবে; স্বতন্ত্রভাবে নয়। আলেমদের কথা সরাসরি কখনো দলীল নয়, বরং তা দলীলের মুখাপেক্ষী।

৫. আহলেহাদীছগণ শরীআতের বিপরীতে কোনো আলেমের বক্তব্যের অনুসরণ করেন না : যদি কোনো ব্যক্তি আলেমদের বক্তব্যকে অহীর জ্ঞানের বিপরীতে মান্য করে অথবা আলেমদের কোনো বিষয়ের হালাল-হারামকারী হিসাবে বিশ্বাস করে তাহলে এটা তাদেরকে রব ও মা‘বূদের স্থানে বসানোর নামান্তর। আদী ইবনু হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ فَقَالَ لِي يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَلْقِ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةٍ حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} [التوبة: ٣١] قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَمْ نَتَّخِذْهُمْ أَرْبَابًا قَالَ بَلَى أَلَيْسَ يُحِلُّونَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَتُحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ تِلْكَ عِبَادَتُهُمْ.

‘আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ক্রুশ ঝুলানো অবস্থায় উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, হে আদী! তোমার গলা হতে এই মূর্তিকে নিক্ষেপ করো। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলে শুনতে পেলাম তিনি সূরা বারাআত (আত-তওবা) পাঠ করছেন। তেলাওয়াত করতে করতে তিনি এই আয়াতে গিয়ে থামলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ﴾

‘(ইয়াহূদী-নাছারাগণ) তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত এবং সংসার-বিরাগী পুরোহিতদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে’ *(আত তাওবা, ৯/৩১)* আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো তাদেরকে আমাদের প্রভু হিসাবে গ্রহণ করিনি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তারা যখন আল্লাহর হারামকৃত কোনো জিনিসকে তোমাদের জন্য হালাল করত, তখন কি তোমরা তা হালাল হিসাবে গ্রহণ করতে না? আবার যখন তারা আল্লাহর হালালকৃত কোনো জিনিসকে হারাম করত, তখন কি তোমরা তা হারাম হিসাবে গ্রহণ করতে না? আমি বললাম হ্যাঁ, (আমরা এরূপই করতাম)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই তো তাদের ইবাদত’।[৫]

অর্থাৎ আল্লাহর শরীআতের বিপরীতে আলেমদের বক্তব্যের অনুসরণ করা শিরক। মানুষ তাদেরকে প্রভুর মর্যাদা প্রদান করুক বা না করুক, শরীআতের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বক্তব্যকে মেনে নেওয়া তাদেরকে শরীআত প্রণয়নকারী হিসাবে মেনে নেওয়ার সমতুল্য। আর এটাই তাদের প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার শামিল।

(চলবে)

৫. জামেউ বায়ানিল ইলম, ‘তাক্বলীদের ভ্রান্তি এবং তা প্রত্যাখ্যান করা, তাক্বলীদ এবং ইত্তিবার মাঝে পার্থক্য’ অধ্যায়, হা/১৮৬২; তিরমিযী, বায়হাক্বী, হাদীছ হাসান।

একটি লিফলেটের ইলমী জবাব

*-আহমাদুল্লাহ**

ভূমিকা : রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতকে অনুসরণ করার কারণে আমাদের অনেক দ্বীনী ভাই-বোনকে সমাজে নির্যাতিত হতে হয়। তাদেরকে লা-মাযহাবী, ইয়াহূদীদের দালাল আখ্যায়িত করা হয়। বিভিন্নভাবে তাদেরকে কোণঠাসা করার যাবতীয় কলা-কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বগুড়ার একটি প্রসিদ্ধ মাদরাসার জনৈক মুফতীর লিখিত একটি লিফলেট আমাদের হস্তগত হয়েছে। এখানে তিনি ১৩টি মাসআলা উদ্ধৃত করেছেন। যেগুলোতে তিনি অগ্রহণযোগ্য কিছু হাদীছ এনে আহলেহাদীছ ভাইদের ফেতনায় পতিত করার অপচেষ্টা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে তাহক্বীক্বসহ আলোকপাত করা হলো।-

(১) তাকবীরে তাহরীমার সময় কান বরাবর হাত উত্তোলন করা : এ বিষয়ে লেখক একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো- ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ 'আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে ছালাত সূচনার প্রাক্কালে কান বরাবর হাত তুলতে দেখেছি'।[১]

তাহক্বীক্ব : এ হাদীছটি ছহীহ। আমরা এ হাদীছের উপর আমল করি। তাহলে এ হাদীছটি কেন আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হলো বিষয়টি বোধগম্য নয়! তবে ছালাত শুরুর সময়ে কান স্পর্শ করার কোনো হাদীছ নেই। এ আমলের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান। এক্ষণে কেউ যদি কান স্পর্শ বা ধরার কোনো হাদীছ পেশ করতে পারেন, তাহলে ইনশা-আল্লাহ আমরা সেটির জবাব প্রদান করব। উল্লেখ্য, আহলেহাদীছগণ কান বরবার কিংবা কাঁধ বরাবর উভয় আমলই করে থাকেন। উভয়ের পক্ষে ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান।[২]

(২) বার বার নয়; শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো : এ শিরোনামে মুফতী ছাহেব একটি হাদীছ পেশ করেছেন। সেটি হলো- আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ 'আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর ছালাত বলে দিব না? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে প্রথমবার (তাকবীরে তাহরীমার সময়) দুহাত উত্তোলন করলেন এবং আর হাত উঠাননি'।[৩]

তাহক্বীক্ব : প্রথম জবাব : এ হাদীছটি সনদ ও মতন উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই যঈফ। ইমামগণ বলেন—

(১) শায়খুল ইসলাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃ. ১৮১ হি.) বলেছেন, لَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ 'ইবনু মাসঊদের (নামে বর্ণিত) হাদীছটি প্রমাণিত নয়'।[৪]

(২) ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃ. ২০৪ হি.) রফউল ইয়াদায়েন না করার হাদীছগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৫]

(৩) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃ. ২৪১ হি.) এই বর্ণনার উপর বিরূপ মন্তব্য করেছেন।[৬]

(৪) আবূ হাতেম আর-রাযী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, 'এটি ভুল। বলা হয়, সুফিয়ান ছাওরী (রাহিমাহুল্লাহ) এতে (হাদীছটি সংক্ষেপে বর্ণনায়) ভ্রমে পতিত হয়েছেন'।[৭]

(৫) ইমাম দারাকুত্বনী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃ. ৩৮৫ হি.) একে 'গায়রু মাহফূয' (যঈফ হাদীছের একটি প্রকার) বলেছেন।[৮]

(৬) স্বয়ং ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন, هَذَا حَدِيْثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ 'এই হাদীছটি একটি দীর্ঘ হাদীছের সংক্ষিপ্ত রূপ। আর এই শব্দে হাদীছটি ছহীহ নয়'।[৯]

দ্বিতীয় জবাব : এই হাদীছটি সুফিয়ান ছাওরী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর উপর ভিত্তিশীল, যা এর (হাদীছটির) তাখরীজ হতে স্পষ্ট হয়। সুফিয়ান ছাওরী ছিক্বাহ, হাদীছের হাফেয, ইবাদতগুযার হওয়ার পাশাপাশি তিনি মুদাল্লিসও ছিলেন।[১০] তাকে নিম্নোক্ত হাদীছের ইমামগণ মুদাল্লিস বলেছেন—

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. আবূ দাঊদ, হা/৭২৮।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৬; আবূ দাঊদ, হা/৭২৮।

৩. সুনানে নাসাঈ, হা/১০২৫।

৪. সুনানে তিরমিযী, হা/২৫৬, 'সনদ ছহীহ'।

৫. কিতাবুল উম্ম, ৭/২০১, 'ছালাতে রফউল ইয়াদায়েন করার অনুচ্ছেদ'।

৬. জুযউ রফইল ইয়াদায়েন, হা/৩২; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের বর্ণনা, ১/২৪০, অনুচ্ছেদ-৩২৬।

৭. ই'লালুল হাদীছ, হা/২৫৮।

৮. দারাকুত্বনী, আল-ই'লাল, মাসআলা-৮০৪।

৯. সুনানে আবূ দাঊদ, (হিমস কপি), হা/৭৪৮; বায়তুল আফকার আদ-দাওলিয়াহ'র কপি, পৃ. ১০২; নুসখা মাকতাবাতুল মাআরিফ, (রিয়াদ), পৃ. ১২১; মিশকাতুল মাছাবীহ, হা/৮০৯।

১০. তাকরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ২৪৪৫।

www.al-itisam.com

(১) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান।[১১]

(২) ইমাম বুখারী।[১২]

(৩) ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন।[১৩]

(৪) আবূ মুহাম্মাদ আল-মাক্বদেসী।[১৪]

(৫) ইবনুত তুরকুমানী হানাফী।[১৫]

(৬) ইবনু হাজার আসক্বালানী।[১৬]

(৭) যাহাবী।[১৭] তিনি বলেন, أنه كان يدلس عن الضعفاء ولكن له نقد وذوق ولا عبرة لقول من قال: يدلس ويكتب عن الكذابين 'সুফিয়ান যঈফ রাবীদের হতে তাদলীস করতেন। কিন্তু তার হাদীছ সমালোচনা ও গবেষণার যোগ্যতা আছে। তিনি তাদলীস করতেন ও কাযযাবদের (মিথ্যুকদের) থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন— যারা এই কথা বলেছেন তাদের এ বক্তব্য মোটেও গণনার যোগ্য নয়। তিনি আরো বলেছেন, وَرُبَّمَا دَلَّسَ عَنِ الضُّعَفَاءِ 'তিনি কখনো কখনো যঈফ রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন'।[১৮] তিনি আরো বলেছেন, لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الضُّعَفَاءِ 'কেননা তিনি যঈফ রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন'।[১৯] হাফেয যাহাবীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হলো, সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ যঈফ লোকদের হতে তাদলীস করতেন। মনে রাখতে হবে, যে যঈফ রাবীদের থেকে তাদলীস করে তার عَنْ 'হতে' শব্দযোগে বর্ণনা সাধারণত যঈফ হয়।

(৮) ছালাহুদ্দীন আল-আলাঈ বলেছেন, من يدلس عن أقوام مجهولين لا يدرى من هم كسفيان الثوري 'যে সুফিয়ান ছাওরীর মতো ঐ সকল মাজহূল রাবী থেকে তাদলীস করে যাদের ব্যাপারে জানা যায় না যে তারা কারা?'।[২০]

(৯) হাফেয ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'সুফিয়ান ছাওরী এবং অন্যরা ঐ সকল রাবী হতেও তাদলীস করেছেন, যাদের থেকে তারা হাদীছ শ্রবণ করেননি'।[২১]

(১০) আলী ইবনুল মাদীনী।[২২]

(১১) বদরুদ্দীন আইনী হানাফীও বলেছেন, وسُفْيَان من المدلسين والمدلس لَا يُحتَج بعنعنته إِلَّا أَن يثبت سَمَاعه من طَرِيق آخر 'সুফিয়ান ছাওরী অন্যতম মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবীর আনআনাহ দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। যদি অন্য সনদে 'শ্রবণের' বিষয়টি পাওয়া যায়, তাহলে দলীল হিসাবে গৃহীত হবে'।[২৩] এছাড়াও কিরমানী,[২৪] ইবনু হিব্বান,[২৫] সুয়ূতী,[২৬] হালাবী[২৭]সহ অনেক ইমামই তাকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন।

(১২) 'যুগের স্বর্ণ' খ্যাত শায়েখ আব্দুর রহমান আল-মুআল্লিমী আল-ইয়ামানীও এই বর্ণনাকে সুফিয়ান ছাওরীর আনআনার (عَنْ-দ্বারা বর্ণনা) কারণে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন।[২৮]

সারাংশ : সুফিয়ান ছাওরী মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। সুতরাং তার মুআনআন বর্ণনা মুতাবাআতের অনুপস্থিতিতে যঈফ হয়।

তৃতীয় জবাব : সুফিয়ান ছাওরীর এই হাদীছে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইয়াদায়েন উল্লেখ নেই। সুতরাং এই বর্ণনাটির ভাষা অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত। যদি একে عام 'সর্বজনীন মর্মবাহী' ধারণা করা হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্ন—

(১) বিতর ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পরে রুকূর আগে রফউল ইয়াদায়েন কেন করা হয়? (২) দুই ঈদের ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পরে রফউল ইয়াদায়েন কেন করা হয়?

চতুর্থ জবাব : এই হাদীছে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইয়াদায়েন উল্লেখ নেই। ইমাম, ফক্বীহ, মুহাদ্দিস আবূ দাঊদ রাহিমাহুল্লাহ এই যঈফ হাদীছের উপরে অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন, بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ 'যারা রুকূর সময় রফউল ইয়াদায়েন উল্লেখ করেননি তার অনুচ্ছেদ'।[২৯]

ইবনুত তুরকুমানী হানাফী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৫ হি.) বলেছেন, ومن لم يذكر الشيء ليس بحجة على من ذكره 'যে কোনো বস্তুকে উল্লেখ করেনি; তা ঐ লোকের উপর দলীল নয়, যে কোনো বিষয়কে

১১. আহমাদ, কিতাবুল ই'লাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল, ১/২০৭, নং ১১৩০; খত্বীব আল-বাগদাদী, আল-কিফায়া, পৃ. ৩৬২।
১২. তিরমিযী, আল-ই'লালুল কাবীর, ২/৯৬৬।
১৩. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, ৪/২২৫।
১৪. ক্বাছীদা ফিল মুদাল্লিসীন, পৃ. ৪৭, ২য় কবিতা।
১৫. আল-জাওহারুন নাক্বী, ৮/২৬২।
১৬. ত্বাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, পৃ. ৩২; তাকরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ২৪৪৫।
১৭. মীযানুল ই'তিদাল, ২/১৬৯।
১৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭/২৪২।
১৯. প্রাগুক্ত, ৭/২৭৪।
২০. জামেউত তাহছীল ফী আহকামিল মারাসীল, পৃ. ৯৯।
২১. শারহু ইলালিত তিরমিযী, ১/৩৫৮।
২২. আল-কিফায়া, পৃ. ৩৬২।
২৩. উমদাতুল ক্বারী, ৩/১১২।
২৪. শারহু ছহীহিল বুখারী, হা/২১৩, ৩/৬২।
২৫. আল-ইহসান, (নতুন মুদ্রণ), ১/৬১।
২৬. আসমাউ মান উরিফা বিত তাদলীস, রাবী নং ২৪।
২৭. আত-তাবঈন ফী আসমা আল-মুদাল্লিসীন, পৃ. ২৭।
২৮. আত-তানকীল বিমা ফী তা'নীবিল কাওছারী মিনাল আবাত্বীল, ২/২০।
২৯. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৭৪৮, ১/৪৭৭।

উল্লেখ করে'।[৩০] প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, وَلَا يلْزم من عدم ذكر الشَّيْء عدم وُقُوعه 'কোনো বস্তুর অনুল্লেখ থাকা উক্ত বস্তুর অস্তিত্ব না থাকাকে আবশ্যক করে না'।[৩১]

সুতরাং ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর (রুকূর রফউল ইয়াদায়েনের) উল্লেখবিহীন এই যঈফ হাদীছ দ্বারা রুকূর আগে ও পরে রফউল ইয়াদায়েন বর্জন করা প্রমাণিত হতে পারে না।

পঞ্চম জবাব : সুফিয়ানের হাদীছে 'না-বোধক' ভাষা রয়েছে। আর রফউল ইয়াদায়েনের পক্ষের হাদীছগুলোতে 'হ্যাঁ-বোধক' ভাষা আছে। আর এই বিষয়টি সাধারণ ছাত্ররাও জানেন যে, 'হ্যাঁ-বোধক' (বক্তব্য) 'না-বোধক' (الْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي)-এর উপরে প্রাধান্য পায়।

আল্লামা নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, রফউল ইয়াদায়েন করার হাদীছসমূহ মানার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। কারণ এগুলো 'হ্যাঁ-বোধক' হাদীছ। আর সুফিয়ানের রফউল ইয়াদায়েন না করার যঈফ হাদীছটি 'না-বোধক'।[৩২] আল্লামা কারখী হানাফীও রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৭ হি.) 'হ্যাঁ-বোধক'-কে 'না-বোধক'-এর উপর আমলের অধিক উপযুক্ত বলেছেন।[৩৩] এছাড়াও নাছবুর রায়াহ[৩৪] ও ফাতহুল বারী[৩৫] দেখুন ।

ষষ্ঠ জবাব : এই হাদীছটির উদ্দেশ্য এই যে, ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকবীরে তাহরীমার সময় কেবল একবার রফউল ইয়াদায়েন করেছেন, বারবার করেননি।[৩৬] নববী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেছেন, 'আমাদের সাথীগণ উল্লেখ করেছেন, যদি এ হাদীছটি ছহীহ হতো, তবে তার সারমর্ম এই হতো যে, ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছালাতের শুরুতে ও অবশিষ্ট রাকআতের শুরুতে দ্বিতীয়বার রফউল ইয়াদায়েন করতেন না। এই তাবীল দ্বারা সকল হাদীছের উপরে আমল করা হয়ে যায়'।[৩৭]

সপ্তম জবাব : এই হাদীছটি ছহীহ হলেও তা মানসূখই হতো। ইমাম আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী বলেছেন, وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ قَبْلَ أَنْ يُشْرَعَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، ثُمَّ صَارَ التَّطْبِيقُ مَنْسُوخًا، وَصَارَ الْأَمْرُ فِي السُّنَّةِ إِلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَخَفِيَا جَمِيعًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ '(হতে পারে) শুরুতে রফউল ইয়াদায়েনের আমল অব্যাহত ছিল। যে সময় রফউল ইয়াদায়েন শরীআতভুক্ত ছিল না। তারপরে ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এর তাত্ববীক্ব করা রহিত হয়ে গেছে। অতঃপর রুকূর আগে ও পরে রফউল ইয়াদায়েন করার সুন্নাত আরম্ভ হয়ে যায়। আর এ বিষয় দুটিই ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গোপন থেকে গিয়েছিল'।[৩৮]

জ্ঞাতব্য : এটি ইলযামী জবাব। নতুবা বাস্তবতা এই যে, এই হাদীছটি ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিতই নয়।

শেষ কথা : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো, জনৈক মুফতীর প্রদত্ত হাদীছটি দুটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়— ১. এটি ছহীহ নয়। ২. ছহীহ মেনে নিলেও এর দ্বারা রুকূর আগে ও পরে রফউল ইয়াদায়েন করা বাতিল হবে না। কেননা এখানে শুধু একবারের কথা উল্লেখ রয়েছে, যা দ্বারা রুকূর আগে ও তাকবীরে তাহরীমার মধ্যবর্তীতে একবার হাত তোলা বুঝানো হয়েছে। রুকূর আগে ও রুকূ হতে মাথা তোলার পরের হাত তোলার সাথে এ হাদীছের কোনোই সম্পর্ক নেই।

(৩) নাভির নিচে হাত বাঁধা : ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ 'আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে ছালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত নাভির নিচে রাখতে দেখেছি'।[৩৯]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সনদ ছহীহ। তবে এখানে ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে 'নাভির নিচে' শব্দদয় অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা-এর দুটি হাদীছ দেখলেই বিষয়টি বুঝা যাবে। যেমন—

হাদীছ-১ :

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ.

'ওয়ায়েল ইবনু হুজর তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে ছালাতে তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর বাঁধতে দেখেছি'।[৪০] 'মাকতাবা শামেলা'-তে এ

---

৩০. আল-জাওহারুন নাকী, ৪/৩১৭।
৩১. আদ-দিরায়া, হা/২৯২, ১/২২৫, 'পানি চাওয়া' অনুচ্ছেদ।
৩২. আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব, ৩/৪০৩।
৩৩. নূরুল আনওয়ার, পৃ. ১৯৭।
৩৪. নাছবুর রায়াহ, ১/৩৫৯।
৩৫. ফাতহুল বারী, ১/৩৩৩।
৩৬. মিশকাতুল মাছাবীহ, হা/৮০৯।
৩৭. আল-মাজমূ', ৩/৪০৩।
৩৮. মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল-আছার, পাণ্ডুলিপি ১/২২০; ইমাম হাফেয গোন্দালবী, আত-তাহক্বীক্ব আর-রাসেখ ফী আন্না আহাদীছা রফইল ইয়াদায়েন লায়সা লাহা নাসিখ, পৃ. ১১৮।
৩৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৯৫৯।
৪০. প্রাগুক্ত, হা/৩৯৩৮।

হাদীছটি এভাবেই রয়েছে। এখানে নাভির নিচে সংক্রান্ত কোনো আলোচনাই নেই। আর এটাই সঠিক। উল্লেখ্য, এটি মারফূ‘ হাদীছ।

হাদীছ-২ :

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

‘ইবরাহীম নাখাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘তিনি ছালাতে তার ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভির নিচে বাঁধতেন’।[৪১]

দ্বিতীয় হাদীছে ‘নাভির নিচে’ শব্দ বলা হয়েছে। এটি মাক্বতূ‘ বর্ণনা। তবে তা যঈফ। কিন্তু হানাফী বিদ্বান শায়খ আওয়ামার তাহক্বীক্বকৃত কপিতে প্রথম হাদীছটি এভাবে আছে—

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

ওয়ায়েল ইবনু হুজর তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ‘আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ছালাতে তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভির নিচে বাঁধতে দেখেছি’।[৪২]

অর্থাৎ শায়খ আওয়ামা মারফূ‘ হাদীছটির মধ্যে ঐ শব্দগুলো অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, যেগুলো মাক্বতূ‘ বর্ণনাটির মধ্যে রয়েছে। একটি যঈফ মাক্বতূ‘ বর্ণনা থেকে কিছু শব্দ নিয়ে তা অন্য একটি ছহীহ মারফূ‘ হাদীছের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে।

এটি স্পষ্ট বিকৃতি। এটা যে বিকৃতি তা সর্বপ্রথম পাকিস্তানের মুহাক্কিক উস্তাদ ইরশাদুল হক আছারী রাহিমাহুল্লাহ ধরিয়ে দেন। তিনি **‘আল-মুছান্নাফ গ্রন্থে বিকৃতি সাধন : শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামার দুঃসাহস’** শিরোনামে একটি বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যা গবেষকদের অধ্যয়নযোগ্য।[৪৩] তবে এখানে কয়েকটি বিষয় পাঠকদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে—

(১) দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম পাকিস্তানের করাচীস্থ ‘ইদারাতুল কুরআন ওয়াল-উলূমিল ইসলামিয়া’ নামক একটি হানাফী প্রকাশনী ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মারফূ‘ হাদীছটির মধ্যে ‘নাভির নিচে’ অংশটুকু সংযোজন করে।

(২) আব্দুল খালেক আফগানীর তাহক্বীক্বকৃত নুসখা যা হায়দরাবাদের ‘আবুল কালাম আযাদ একাডেমী হিন্দুস্তান’ হতে প্রথম মুদ্রিত (১৩৮৬ হি./১৯৬৬) হয়েছিল, তাতে ওয়ায়েল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীছের মধ্যে ‘নাভির নিচে’ অংশটুকু নেই।

(৩) ‘আদ-দারুস সালাফিয়া মুম্বাই হিন্দুস্তান’ হতে মুদ্রিত (১৩৯৯ হি./১৯৭৬) ইবনু আবী শায়বা-এর নুসখাটিও এই সংযোজনমুক্ত।

(৪) ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানীর কট্টর বিরোধী হানাফী দেওবন্দী আলেম হাবীবুর রহমান আযামী কর্তৃক তাহক্বীক্বকৃত ইবনু আবী শায়বার নুসখাটি ১৪০৩ হিজরীতে ‘মাকতাবা ইমদাদিয়া মক্কা মুকাররমা’ প্রকাশ করে। সেটিও এই সংযোজন হতে খালি।

(৫) ১৪০৯ হিজরীতে বৈরূতের দারুত তাজ প্রকাশিত ও কামাল ইউসুফ আল-হূত তাহক্বীক্বকৃত নুসখাতেও এই সংযোজন নেই।

(৬) ১৪০৯ হিজরীতে দারুল ফিকর হতে মুদ্রিত ও সাঈদ আল-লাহহাম কর্তৃক তাহক্বীক্বকৃত নুসখাতেও এটি নেই।

(৭) ১৪১৬ হিজরীতে বৈরূতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়া হতে মুদ্রিত মুছান্নাফের নুসখাতেও এটি নেই, যেটি তাহক্বীক্ব করেছেন মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শাহীন।

(৮) ১৪২৫ হিজরীতে রিয়াদের মাকাতাবা রুশদ হতে হামদ আল-জুমুআ ও মুহাম্মাদ লুহাইদান কর্তৃক তাহক্বীক্বকৃত মুছান্নাফের নুসখাতেও নেই।

(৯) ১৪২৯ হিজরীতে মিসরের দারুল ফারূক হতে মুদ্রিত ও উছামা ইবনু ইবরাহীমের তাহক্বীক্বকৃত নুসখাতেও নেই।

(১০) ১৪৩৬ হিজরীতে রিয়াদের দারু কুনূযি ইশবীলিয়া হতে মুদ্রিত ও সা‘দ ইবনু নাছের আশ-শাতরীর তাহক্বীক্বে প্রকাশিত ইবনু আবী শায়বার নুসখাতেও এই সংযোজনটি নেই।

কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানেই ক্ষান্ত হতে হচ্ছে। নতুবা এভাবে অসংখ্য দলীল দেওয়া যাবে, যা দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত মারফূ‘ হাদীছে ‘নাভির নিচে’ শব্দদ্বয় মূল হাদীছে ছিল না। বরং পরবর্তীতে সর্বপ্রথম একটি হানাফী প্রকাশনী হতে এটি জোর করে হাদীছের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

অতএব, জনৈক ওই মুফতী ছাহেবের দেওয়া লিফলেটে থাকা হাদীছটির সনদ ছহীহ হলেও তাতে এই সংযোজনের লেশমাত্রও প্রমাণিত নয়।

(চলবে)

৪১. প্রাগুক্ত, হা/৩৯৩৯।
৪২. মুহাম্মাদ আওয়ামা, তাহক্বীক্ব মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৯৫৯, ৩/৩২০-৩২২।
৪৩. মাক্বালাতে আসারী, ৩/২৮৫-৩১২।

রামাযান পরবর্তী আমলসমূহ

*-ইবনু আকবার**

পবিত্র রামাযান মাসের পরে শাওয়াল মাস। রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা প্রত্যেক বালেগ, সুস্থ, মুক্বীম, বিবেকবান মুসলিমের জন্য ফরয। এই ফরয ছিয়াম পালন করলে দায়মোচন হবে এবং ফযীলতও অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। তবে শাওয়াল মাসের ছিয়ামসহ অন্যান্য মাস ও দিনের ছিয়াম পালন করা নফল। আর প্রত্যেক নফলের ফযীলত বা ছওয়াব রয়েছে।

শাওয়াল মাসের ছয়টি নফল ছিয়ামের ফযীলত :

শাওয়াল মাসের ছয়টি নফল ছিয়াম পালন করলে পূর্ণ এক বছর ছিয়াম পালনের ছওয়াব হবে। তবে শর্ত হলো এর পূর্বে রামাযান মাসের পূর্ণ ছিয়াম পালন করতে হবে। আবূ আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ 'যে রামাযান মাসের ছিয়াম রাখবে। অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করবে। সে পূর্ণ এক বছর ছিয়াম পালনের ছওয়াব পাবে'।[১] এই হাদীছ থেকে আমরা বুঝতে পারি :

(১) রামাযানের ছিয়াম অপরিহার্য অথচ ফযীলতপূর্ণ।

(২) শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়ামের দিন-তারিখ অনির্দিষ্ট। মাসের প্রথম বা মধ্য বা শেষ যেকোনো দিন ছিয়াম রাখা যাবে। তাতেই উক্ত এক বছরের ফযীলত অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। মাসের শুরু থেকে ছিয়াম রাখতে হবে মর্মে বক্তব্য দলীলহীন। এ ব্যাপারে ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قال أصحابنا والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فان فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال.

'আমাদের সাথীগণ বলেন, ঈদুল ফিত্বরের পরের দিন থেকে ধারাবাহিকভাবে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করা ফযীলতপূর্ণ। যদি কেউ বিচ্ছিন্নভাবে ছিয়াম রাখে বা দেরি করে শাওয়াল মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেকোনো দিন ছিয়াম রাখে, তাহলে রামাযান মাসের অনুগামী হওয়ার ফযীলত অর্জিত হবে। কারণ সে রামাযানের পরে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রেখেছে'।[২] আল্লামা ছানআনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শাওয়াল মাসের শুরু থেকে ছিয়াম রাখা উত্তম মর্মে কোনো দলীল নেই। যখন কেউ শাওয়ালের যেকোনো দিন উক্ত ছিয়াম পালন করবে সে রামাযানের পরে ছয়টি ছিয়াম রেখেছে'।[৩] আবুল আব্বাস আহমাদ আল-কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

(ثم أتبعه ستًّا من شوال) ليس فيه دليل على أنها تكون متصلة بيوم من الفطر بل لو أوقعها في وسط شوال أو آخره لصلح تناول هذا اللفظ له لأن (ثم) للتراخي وكل صوم يقع في شوال فهو متبع لرمضان وإن كان هنالك مهلة وقد دل على صحة هذا قوله في حديث النسائي (وستة بعد الفطر) ولذلك نقول إن الأجر المذكور حاصل لصائمها مجموعة أوقعها أو مفترقة لأن كل يوم بعشر مطلقًا والله تعالى أعلم.

'(অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়ামকে রামাযানের অনুগামী করবে) হাদীছের এই অংশে কোনো দলীল নেই যে, উক্ত ছিয়াম ঈদুল ফিত্বরের পরের দিন থেকে লাগাতারভাবে পালন করতে হবে। বরং যদি উক্ত ছিয়াম শাওয়াল মাসের মধ্যে বা শেষে সংঘটিত হয়, তাহলেও তার জন্য এই শব্দের ব্যবহার ঠিক হয়েছে। কেননা ثم শব্দটি দেরি করার অর্থ দেয় (বিরতি দিয়ে বুঝায়) এবং প্রত্যেক ছিয়াম যা শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়, তা রামাযান মাসের অনুগামী। যদিও সেখানে অন্য কিছু হওয়ার সুযোগ আছে। আর একথার সত্যতা প্রমাণে নাসাঈর একটি হাদীছে এসেছে— (এবং ঈদুল ফিত্বরের পর ছয়টি ছিয়াম) এ কারণে আমরা বলব, অবশ্যই ছিয়াম পালনকারীর উল্লেখিত ছওয়াব অর্জিত হবে সেগুলো অবিচ্ছিন্নভাবে পালন করা হোক বা বিচ্ছিন্নভাবে পালন করা হোক। কারণ সাধারণভাবে প্রত্যেক দিন সমান ১০ দিন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত'।[৪]

---

* চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪; আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৩; তিরমিযী, হা/৭৫৯; আহমাদ, হা/২৩৫৬১।

২. শারহু মুসলিম, ৮/৫৬।

৩. সুবুলুস সালাম, ৩/৩৫৪।

৪. মুফহিম, ৫/২৩।

(৩) ধারাবাহিকভাবে ছয়টি ছিয়াম রাখা যাবে এবং বিরতি দিয়েও রাখা যাবে। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নফল ছিয়াম কখনো লাগাতার রেখেছেন আবার কখনো ধারাবহিকভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে নবী দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর এক দিন পরপর ছিয়াম রাখাকে উত্তম বলেছেন।

(৪) 'ছিয়ামুদ দাহর' দ্বারা এক বছর উদ্দেশ্য। (৫) এক বছর ছিয়াম রাখার ছওয়াব পাওয়া যাবে মাত্র ৩৬ দিন ছিয়াম পালন করলে। রামাযান মাসের ৩০ দিন এবং শাওয়াল মাসের ৬ দিন। মোট ৩৬ দিন।

(৬) ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এই হাদীছ বলছে, যখন রামাযান মাস শেষ হয়, তখন কল্যাণের দরজা বন্ধ হয়ে যায় না। কল্যাণের দরজা খোলা রাখা হয়। কাজেই তুমি শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রাখো। যদি তুমি রামাযান মাসের ছিয়াম রাখার পর শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম রাখ, তাহলে তুমি যেন পূর্ণ এক বছর ছিয়াম রাখলে। এরপর ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) অন্যান্য মাসের নফল ছিয়ামগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন কল্যাণের দরজা খোলা থাকার প্রমাণস্বরূপ'।[৫]

ছয়টি ছিয়াম দ্বারা এক বছর ছিয়ামের সমপরিমাণ ছওয়াব : ছাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 'যে রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করে এবং ঈদুল ফিত্বরের পর ছয়টি ছিয়াম রাখে, তার এই ছিয়ামগুলো পূর্ণ এক বছর ছিয়াম পালনের সমপরিমাণ। (আল্লাহর বাণী) 'যে একটি পুণ্য কাজ সম্পাদন করবে, সে অনুরূপ দশটি পুণ্যের অধিকারী হবে''।[৬] ছাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ فَشَهْرٌ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ 'মহান আল্লাহ কারো একটি পুণ্য কাজকে ১০ দিয়ে গুণ করবেন। সে হিসাবে রামাযান মাসের ৩০ দিন সমান ১০ মাস। (৩০×১০=৩০০ দিন) এবং ঈদুল ফিত্বরের পর শাওয়াল মাসের ছয় দিনের ছিয়াম সমান ২ মাস (৬×১০=৬০)। সব মিলে এক বছর (৩০০+৬০=৩৬০ দিন, ১ বছর)'।[৭]

আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নফল ছিয়াম লাগাতার রাখতেন : আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ 'রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এমনভাবে ছিয়াম রাখতেন, যাতে আমরা মনে মনে বলতাম তিনি আর ছিয়াম ছাড়বেন না এবং এমনভাবে ছিয়াম ছাড়তেন, যাতে আমরা মনে মনে বলতাম, তিনি আর ছিয়াম রাখবেন না'।[৮] এই হাদীছটি প্রমাণ করে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নফল ছিয়াম লাগাতার রাখতেন অর্থাৎ দৈনিক রাখতেন। অতএব, বুঝা যায় যে, শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম লাগাতার রাখা যাবে।

এক দিন পরপর ছিয়াম রাখা : একদিন পরপর ছিয়াম রাখা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, যা দাঊদ (আলাইহিস সালাম) করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন, أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর ছিয়াম পালনপদ্ধতি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তিনি এক দিন ছিয়াম রাখতেন এবং এক দিন রাখতেন না। আর দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর ছালাতের পদ্ধতি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তিনি অর্ধরাত ঘুমাতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ ছালাত পড়তেন, আবার এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন'।[৯] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا 'নবী দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর ছিয়াম পালনপদ্ধতি সর্বোত্তম। দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এক দিন ছিয়াম রাখতেন, তো এক দিন বাদ দিতেন'।[১০] হাফেয ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْأَفْضَلِيَّةِ مُطْلَقًا 'রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী ফয়সালা দিচ্ছে, সমস্ত (নফল) ছিয়ামের ক্ষেত্রেই এই উৎকৃষ্টতা সাব্যস্ত'।[১১]

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, যেসব নফল ছিয়াম অনির্দিষ্ট, সেগুলো নবী দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর পদ্ধতিতে আদায় করা উত্তম বা প্রিয়। তাই শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম এক দিন পরপর আদায় করলে বা আরো বিরতি দিয়ে আদায় করলে উত্তম হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রত্যেক মাসের তিন দিনের ছিয়াম এক বছরের সমান : আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي

---

৫. আরবাঈন, ৭/৬৪।
৬. ইবনু মাজাহ, হা/১৭১৫; বায়হাক্বী, হা/৮৬৯৪, হাদীছ ছহীহ।
৭. নাসাঈ, হা/২৮৬১; আহমাদ, হা/২২৪১২, (নাসাঈর শব্দ), হাদীছ ছহীহ।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।
১০. নাসাঈ, হা/২৩৮৮-২৩৮৯, হাদীছ ছহীহ।
১১. ফাতহুল বারী, ৬/২৪৮।

كِتَابِهِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا الْيَوْمُ بِعَشَرَةٍ 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিনটি করে ছিয়াম পালন করে, তার জন্য সেটি এক বছরের ছিয়াম হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এ কথার সত্যায়নস্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন— 'যে একটি পুণ্য কাজ সম্পাদন করবে, সে অনুরূপ দশটি পুণ্যের অধিকারী হবে। তাই এক দিন সমান ১০ দিন'।[১২]

বুঝা যাচ্ছে, এক দিন ছিয়াম রাখলে ১০ দিন ছিয়াম রাখা সাব্যস্ত হবে। তাহলে তিন দিন ছিয়াম রাখলে ৩০ দিন ছিয়াম রাখা হবে। তাই প্রত্যেক মাসে তিনটি করে ছিয়াম রাখলে পূর্ণমাস ছিয়াম পালন করা সাব্যস্ত হবে। এভাবেই পূর্ণ এক বছর ছিয়াম পালনের ছওয়াব হবে ইনশাআল্লাহ। রামাযান মাসে তো সারা মাস ছিয়াম পালন করতেই হবে।

প্রত্যেক মাসে তিন দিন ছিয়াম এক বছরের সমান, তবে সাথে রামাযানের ছিয়াম শর্তযুক্ত : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ 'প্রত্যেক মাসের তিনটি ছিয়াম এবং এক রামাযান থেকে অন্য রামাযানের ছিয়াম, সারা বছর ছিয়াম রাখার সমান'।[১৩] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ 'ধৈর্যের মাস (রামাযান) এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিনের ছিয়াম এক বছরের ছিয়াম হিসাবে গণ্য'।[১৪]

উপর্যুক্ত হাদীছদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, প্রত্যেক মাসে তিন দিন করে ছিয়াম রাখলে পূর্ণ এক বছরের ছিয়াম রাখার সমান হবে বা পূর্ণ এক বছর ছিয়াম রাখার ছওয়াব হবে। কিন্তু রামাযান মাসের ফরয ছিয়াম অবশ্যই রাখতে হবে, নচেৎ নয়।

মাসের তিনটি ছিয়াম, যা এক বছরের সমান : মাসের তিনটি ছিয়াম, যা এক বছরের সমান— চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে তা রাখা উত্তম। আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ 'হে আবূ যার! যখন মাসের তিনটি ছিয়াম রাখবে— তা ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে'।[১৫] তবে সম্ভব না হলে মাসের যেকোনো দিনে তা রাখা যায়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ مِنْ أَيِّهِ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ كَانَ 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করতেন। মুআয বলেন, আমি বললাম, তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাসের কোন দিন এই ছিয়াম রাখতেন? আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, মাসের যে কোনো দিন তিনি ছিয়াম রাখতেন, এতে তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোনো পরোয়া করতেন না'।[১৬]

হাফেয ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত হাদীছগুলো উল্লেখ করে বলেন, وَقَالَ الرُّويَانِيُّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَبٌّ فَإِنْ اتَّفَقَتْ أَيَّامُ الْبِيضِ كَانَ أَحَبَّ. وَفِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ اسْتِحْبَابَ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ غَيْرُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ 'রুইয়ানী বলেন, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের ছিয়াম মুস্তাহাব। যদি ছিয়াম তিনটি আইয়ামে বীয তথা ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখা হয়, তাহলে তা হবে অতি উত্তম। আর বহু বিদ্বানের বক্তব্য হলো, আইয়ামে বীযের (১৩, ১৪ ও ১৫) ছিয়াম এবং প্রত্যেক মাসের তিনটি মুস্তাহাব ছিয়াম পৃথক পৃথক ছিয়াম।[১৭]

মাসের তিনটি ছিয়াম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দিনগুলোতে পালন করতেন : ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ الْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيهِ 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মাসের তিনটি ছিয়াম রাখতেন। মাসের প্রথম সোমবার, তার পরের বৃহস্পতিবার, অতঃপর তার পরের বৃহস্পতিবার'।[১৮]

মহান আল্লাহ যেন আমাদের বেশি বেশি নফল ছিয়াম পালন করার তাওফীক্ব দান করেন। আমীন!

১২. ইবনু মাজাহ, হা/১৭০৮; তিরমিযী, হা/৭৬২, হাদীছ ছহীহ।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; আবূ দাঊদ, হা/২৪২৫।
১৪. নাসাঈ, হা/২৪০৮; ইবনু খুযায়মা, হা/২১২৬; আহমাদ, হা/৭৫৬৭, হাদীছ ছহীহ।
১৫. তিরমিযী, হা/৭৬১; বায়হাক্বী, হা/৮৭০৭, হাসান ছহীহ।
১৬. ইবনু মাজাহ, হা/১৭০৯, হাদীছ ছহীহ।
১৭. ফাতহুল বারী, ৬/২৫৫।
১৮. নাসাঈ, হা/২৪১৪, হাদীছ ছহীহ।

ঈমান বৃদ্ধির উপায়

[২০ শা'বান, ১৪৪২ হি. মোতাবেক ২ এপ্রিল, ২০২১। পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন শায়খ বান্দার বিন আব্দুল আযীয বালীলা (হাফি.)। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক ও 'আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ'-এর গবেষণা সহকারী শায়খ মুরসালীন বিন আব্দুর রউফ। খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাঁরই কাছে ক্ষমা ও সাহায্য কামনা করি এবং আশ্রয় চাই অন্তর ও কর্মের অনিষ্ট হতে। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন, যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, এতে কারো কোনো ক্ষমতা নেই। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি, তার পরিবার ও ছাহাবীগণের প্রতি, যিনি উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় প্রকাশিত হয়েছিলেন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। যদি তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে যত্নবান হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করবেন এবং তাকে তোমরা সম্মুখে পাবে। সুখের সময়ে তোমরা আল্লাহকে বুঝার চেষ্টা করলে আল্লাহ তোমাদের কষ্টের সময় বুঝার চেষ্টা করবেন। চাইলে তোমরা কেবল আল্লাহর কাছেই চাও। সাহায্য প্রার্থনা করলে কেবল আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করো।

হে মুসলিমগণ! পৃথিবীতে মানুষকে যা কিছু দেওয়া হয় তার মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস হলো, 'আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান'। এই ঈমান তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন করে। আল্লাহ প্রদত্ত এই নিয়ামত পেলে পূর্বে না পাওয়া কোনোকিছুতে তার আসে যায় না। কারণ সে সামগ্রিক কল্যাণ, সুবিশাল সফলতা ও সুমহান পূর্ণতা পেয়ে গেছে। আর এটা আল্লাহর বড় নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা এই সম্পর্কে বলেন, ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ 'এমনভাবেই আমি আমার আদেশে (দ্বীনের এ) রূহ তোমার কাছে অহী করে পাঠিয়েছি; (নতুবা) তুমি তো (আদৌ) জানতেই না ঈমান কী, কিন্তু একে আমি নূরে পরিণত করেছি, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা (দ্বীনের) পথ দেখাই' *(আশ-শূরা, ৪২/৫২)*।

আল্লাহ ঈমানদারদের ঈমানের মাধ্যমেই বড় পরীক্ষা করে থাকেন। আর এই ঈমান কখনো শক্তিশালী হয়, কখনো দুর্বল হয়, কখনো বাড়ে, কখনোবা কমে। আবার কখনো নতুন ও পুরাতনও হয়ে থাকে। অতএব, মুমিনের কর্তব্য হলো যে, সে তার ঈমানের ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকবে এবং ঈমানের প্রতি যত্নবান হবে। সাথে সাথে আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমানে নতুনত্ব আনবে এবং অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে হ্রাস পাওয়া হতে ঈমানকে রক্ষা করবে। প্রবৃত্তি ও ফেতনা পরিহার করে চলবে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ، فَاتْلُوا الْقُرْآنَ يُجَدِّدُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ 'ঈমান তোমাদের অভ্যন্তরে পুরাতন হয়, যেমন কাপড় পুরাতন হয়ে থাকে। অতএব, তোমরা (বেশি বেশি) কুরআন তেলাওয়াত করো, এতে তোমাদের অন্তরে ঈমান শানিত হবে'।[১]

আর ঈমানের সাথে যেন বাতিলের বাতাস প্রবাহিত না হতে পারে, যার ফলে মুমিনের মাঝে ঈমানের শূন্যতা পেয়ে বসে ও তার অন্তর হতে ঈমানের আলো মুছে যায়। আর এই জন্যই আল্লাহ ঈমানের কিছু উপায় বলে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি ও শক্তিশালী হবে এবং ঈমান হতে অন্ধকার ও আবরণ দূরীভূত হবে। অতএব, যখন কোনো বান্দা নিজের সফলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য, তখন তার জন্য ঈমান বৃদ্ধির উপায়গুলো জানা বিশেষ প্রয়োজন এবং তা নিজের প্রিয়তমা অপেক্ষাও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তা পবিত্রতা ও কল্যাণের উৎস।

ঈমান বৃদ্ধির প্রধান কিছু উপায় বা কারণসমূহ :

(১) চিন্তা সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করা : কুরআন হলো আল্লাহর কালাম, যার মাধ্যমে তাঁর নাম ও গুণাবলি জানা যায় এবং তা হতে শরীআত ও তার বিধি-বিধান উন্মোচিত হয়। যার দিকে অগ্রসর হলে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিলে ক্ষতি ও পরিতাপের বিষয় হিসাবে পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ 'আমি এই বরকতময় কিতাব তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে তারা এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে' *(ছোয়াদ, ৩৮/২৯)*।

এই কিতাবে মুমিনদের জন্য রয়েছে এক বিরাট প্রাপ্তি এবং মুমিনজীবনে রয়েছে এর সম্মানজনক প্রভাব। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ 'আসল মুমিন তো

১. মুসতাদরাকে হাকেম, ১/৪৫; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৫৮৫।

তারাই যাদের নিকট আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয় এবং তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা রাখে' *(আল-আনফাল, ৮/২)*।

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব পড়বে এবং তাঁর আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, নিঃসন্দেহে সে অনেক ইলম অর্জন করতে পারবে। আর এর মাধ্যমে তার ঈমান শক্তিশালী হবে ও বৃদ্ধি পাবে।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সর্বোপরি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ও তেলাওয়াত করা অন্তরের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী, কেননা তা সমস্ত মর্যাদার আধার। এর সাথে ভালোবাসা, আগ্রহ, ভয়, আশা, ভরসা, সন্তুষ্টি, শুকরিয়া, ধৈর্য ও সমস্ত অবস্থা জড়িত রয়েছে। 'চিন্তা-ভাবনার ও গবেষণার সহিত' কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে কী রয়েছে মানুষ যদি তা জানতে পারত, তাহলে সবকিছু ছেড়ে তারা সর্বদা কুরআন তেলাওয়াতেই মগ্ন থাকত।

(২) আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা : হে মুমিনগণ! ঈমান বৃদ্ধির উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম বিষয়টি হলো, আল্লাহ সম্পর্কে ও তাঁর সুন্দরতম নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়া। কেননা এগুলো সম্পর্কে জানলেই মানুষ আল্লাহমুখী হবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 'আল্লাহ তাআলার জন্যই সুন্দরতম নামসমূহ। অতএব, তোমরা সেসব ভালো নামেই তাঁকে ডাকো। যারা তাঁর নামসমূহের বিকৃতি ঘটায়, তাদের পরিত্যাগ করো। যা কিছু তারা করে তার প্রতিদান তাদের দেওয়া হবে' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৮০)*।

অতএব, বান্দা যখন উপকার করা, ক্ষতি করা, দান করা বা ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর এককত্বের কথা বিশ্বাস করবে, তখন তার মাঝে প্রকাশ্যে বা গোপনভাবে তাওয়াক্কুল অর্জিত হবে। সাথে সে এটাও জানতে পারবে যে, আল্লাহ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, তাঁর কাছে আকাশ ও যমীনের কোনো কিছুই গোপন থাকে না; এমনকি মানুষের অন্তর ও চোখের খিয়ানত সম্পর্কেও তিনি অবগত। আর এগুলো জানার ফলে মুমিন বান্দা জিহ্বা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা আল্লাহ পছন্দ করেন না এমন অন্যায় কাজ করা হতে বিরত হবে। সাথে যখন এ কথাও জানতে পারবে যে, তিনি মর্যাদাবান, পুণ্যবান, দয়ালু, অনুগ্রহশীল তখন তার মাঝে আশার শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয়ভাবে ইবাদতের প্রতি আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে ।

যখন সে আল্লাহর পরিপূর্ণতা ও তার সৌন্দর্যের প্রতি অবহিত হবে তখন তার ভালোবাসা ও আগ্রহ আরও বেড়ে যাবে এবং সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা করবে। আর এ বিষয়টি বিভিন্ন ইবাদাতের উপর নির্ভর করে, এ জন্যই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২] অর্থাৎ যারা এর অর্থ বুঝবে এবং তা মুখস্থ করবে সাথে এটাও বিশ্বাস করবে যে, এর মাধ্যমে সে আল্লাহর ইবাদত করছে তাহলে সে জান্নাতে যাবে। আর জান্নাতে কেবল মুমিনরাই প্রবেশ করবে। অতএব, জানা গেলে যে, এটা ঈমান লাভের প্রধান উৎস, যার দিকে ঈমান প্রত্যাবর্তন করে। আর এরই সত্যায়নস্বরূপ আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ 'বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে, নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল' *(আল-ফাতির, ৩৫/২৮)*।

হাফেয ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞ আলেমরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে থাকে, কেননা তারা আল্লাহর মহত্ত্ব ও গুণাবলি সম্পর্কে বেশি অবগত। এছাড়াও কিছু পূর্ববর্তী আলেমগণ বলেন, 'যে যত আল্লাহর ব্যাপারে বেশি অবগত সে তত বেশি আল্লাহকে ভয় করে'।

দ্বিতীয় খুৎবা

সর্বোত্তম প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ এবং শান্তি বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর ও তার পরিবারবর্গ, সাথীবর্গ ও অনুসারীদের উপর।

হে মুমিনগণ! ঈমান বৃদ্ধির উপায়গুলোর মধ্যে হতে আরেকটি উপায় হলো— এই দ্বীনের সৌন্দর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ও এর শরীআতের পরিপূর্ণতার প্রতি অবগত হওয়া এবং আক্বীদা, আখলাক্ব, আদব, ব্যবস্থাপনা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া। কারণ তা শ্রেষ্ঠ বিচারক ও দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা শরীআত।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি তুমি দ্বীনে ইসলাম ও শারীআতে মুহাম্মাদী নিয়ে গবেষণা কর তাহলে দেখতে পাবে কোনো বক্তব্য, বর্ণনা বা জ্ঞানীদের বাণী দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যদিও এতে জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞজনদের সবার জ্ঞানকে একত্রিত করা হয়। তবুও তারা এ কথা বলতে বাধ্য হবে যে, এটা এক মহান কিতাব, যা অনির্বচনীয়; বরং তা নিজেই সত্যের সাক্ষী এবং তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। নিজেই তা প্রামাণ্য দলীল ও তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় এবং কোনো নবী যদি তার স্বপক্ষে দলীল নিয়ে নাও আসতেন, তথাপি তা যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসা দলীল ও নিদর্শন তা প্রমাণি

['হারামাইনের মিম্বার থেকে'-এর বাকী অংশ ৩২ নং পৃষ্ঠায়]

২. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৭।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে?

*-জুয়েল রানা**

ভূমিকা : বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারি থামছেই না। বরং নতুন নতুন রূপে দেখা যাচ্ছে ভাইরাসটিকে এবং একই সাথে সংক্রমণের তিব্রতাও বেড়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে। ফলে দিন দিন পৃথিবীর মানুষ আরো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। ১ বছরের বেশি বা ১৪ মাস ধরে পৃথিবী এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মানুষ চরম দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছে। পৃথিবীর স্বাভাবিক কার্যক্রম পর্যন্ত থমকে গেছে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ : বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় (কোনো কোনো দেশে তৃতীয়) ঢেউয়ে মানুষ দিশেহারা। এই দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ ও মৃত্যুর রেকর্ড অতীত অর্থাৎ আগের ১৩ মাসের পরিসংখ্যানকে ছাড়িয়ে গেছে। শুধু দেশেই নয়, বাংলাদেশের প্রবাসী নাগরিকরাও করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন।

সবার মনে একটা আশা জন্মেছিল যে, বাংলাদেশে করোনা মহামারির অবসান হতে যাচ্ছে। কিন্তু এক মাসের ব্যবধানে আবার সব ওলট-পালট হয়ে গেল। মার্চ মাসের শুরু থেকেই করোনা সংক্রমণ আবার বাড়তে শুরু করে। শীতে সংক্রমণ বাড়ে, গরমে কমে যায়— এ ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে বাংলাদেশে করোনাভাইরাস ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। একের পর এক সংক্রমণে গত এক বছরের রেকর্ডকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। নতুন করোনাভাইরাসের এ সংক্রমণকে স্বাস্থ্য অধিদফতর করোনার ‘দ্বিতীয় ঢেউ’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, করোনার এ দ্বিতীয় ঢেউ বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যায়! গত বছরের জুন-জুলাইয়ে করোনা সংক্রমণের প্রথম ঢেউয়ে সংক্রমণ ছিল তীব্র। এ বছর মার্চ মাস থেকে করোনার ‘দ্বিতীয় ঢেউ’ শুরু হয়েছে। প্রথম ঢেউয়ের চেয়ে দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণের তীব্রতা বেশি। প্রথমবারের চূড়ার চেয়ে দ্বিতীয় ঢেউয়ে দৈনিক শনাক্ত বেশি হচ্ছে।

কোভিড-১৯ করোনা অণুজীবঘটিত কালব্যাধি। তা এখন ‘কোভিড-২১’ হওয়া উচিত। এই মহামারির তৃতীয় তরঙ্গের হাওয়াও না-কি লেগেছে কোনো কোনো রাষ্ট্রে। বাংলাদেশে এর দ্বিতীয় তরঙ্গ বা ঢেউ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু কেন? কেউ বলছেন, কোভিড জীবাণু উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া সইতে পারে না। এখন কেবল উষ্ণতা আছে, আর্দ্রতা নেই। তাই তার পোয়াবারো। বৃষ্টি হলে এর দৌরাত্ম্য কমে যেত। আসলে এর তরঙ্গ সৃষ্টির প্রকৃত কারণ ও করণীয় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন।

কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ ও পুনরায় লকডাউনের কারণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ, রফতানি, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে। উদীয়মান অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ গেল বছরের বিপর্যস্ত অর্থনীতির ধকল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪৪ হাজার ৬৭৫ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি রয়েছে। এ সময়ে শুল্ককর আদায়ের লক্ষ্য ছিল ১ লাখ ৯৬ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। লকডাউন প্রলম্বিত হলে রাজস্ব আদায়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা ও ব্যয়ের সক্ষমতা নতুন করে বাধার সম্মুখীন হতে পারে। পয়লা বৈশাখ, রামাযান ও ঈদকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিতে যে লেনদেন হওয়ার কথা, তাতে যেন বিপর্যয় নেমে না আসে সে দিকে এখনই সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

টিকা নিয়ে তেলেসমাতি : টিকা নিয়ে বিশ্বব্যাপী এক তেলেসমাতি কাণ্ড চলছে। টিকা পাওয়ার ক্ষেত্রে ধনী ও গরীব দেশগুলোর বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিশ্বে যত টিকা সরবরাহ করা হয়েছে, তার বেশির ভাগই পেয়েছে উচ্চ আয়ের দেশগুলো। মাত্র ১ শতাংশেরও কম টিকা পেয়েছে গরীব দেশগুলো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ৭০ কোটি টিকার ডোজ সারা বিশ্বে সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮৭ শতাংশের বেশি পেয়েছে উচ্চ আয় অথবা মধ্যম আয়ের দেশগুলো। বাকিরা পেয়েছে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ।

বাংলাদেশে ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়াটি বেশ হুমকির মুখে পড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ভারতের সিরাম ইন্সটিটিউট চুক্তি মোতাবেক গত দু’দফার ভ্যাক্সিন এখনো দিতে পারেনি। ভ্যাক্সিন সংগ্রহ করতে বাংলাদেশ এখন অন্যান্য একাধিক উৎসের খোঁজে

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; সহকারী শিক্ষক, চম্পাতলী জান্দিপাড়া ইসলামিক একাডেমি, চম্পাতলী বাজার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

নেমেছে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে করোনা ভ্যাক্সিনের চাহিদার যে ব্যাপকতা তাতে ভ্যাক্সিন পাওয়া খুব সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ভ্যাক্সিন সংগ্রহের জন্য কেবল একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে বসে থাকা কি অযৌক্তিক ছিল বাংলাদেশের জন্য? এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সহজ পথ কি খোলা আছে বাংলাদেশের সামনে?

যে সংকটের মুখে বাংলাদেশ পড়েছে, তা থেকে সহজেই বোঝা যায়, শুধু একটি দেশের ওপর নির্ভর করে বসে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। বিশ্বের অনেক দেশ একাধিক কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছে। যেমন— ব্রিটেন চারটি কোম্পানির কাছ থেকে টিকা সংগ্রহ করছে। বাংলাদেশের সামনে এখন রাস্তা দুটি— শীঘ্রই অন্য দেশের সাথে টিকা আমদানির জন্য চুক্তি করা, যেমন ভারত স্পুটনিক ভি ভ্যাক্সিনের জন্য রাশিয়ার সাথে করেছে। আরেকটি পথ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক অনুমোদনপ্রাপ্ত যে কোনো টিকা বাংলাদেশে উৎপাদনের জন্য সত্ত্বাধিকারী কোম্পানির কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া।

লকডাউন কে দেয়, কে মানে : করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় দেশে দফায় দফায় লকডাউন চলেছে। তবে লকডাউনের কারণে শ্রমজীবী খেটেখাওয়া মানুষ মহাবিপদে পড়েছেন। বিশেষ করে যারা দিন এনে দিন খান, তাদের কষ্টের সীমা নেই। সিপিডির গবেষণায় বলা হয়েছে, করোনাকালে শুধু শহরে কাজ হারিয়েছেন ১০ লাখ শ্রমিক। তবে সেটা লকডাউন না-কি হেফাজত ডাউন, তা নিয়ে জনমনে সংশয়ও দেখা দিয়েছে।

পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে লাল, হলুদ ও সবুজ জোন ভাগ করে লকডাউন দেওয়া হয়। একেক জোনের একেক নিয়ম। রেড জোনে ফার্মেসি, নিত্যপণ্য সামগ্রীর দোকান ও কারখানা বন্ধ থাকে। লকডাউনভুক্ত এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। মালয়েশিয়া, আরব দেশ ও ইউরোপে এর প্রচলন রয়েছে। ইতালি, ফ্রান্সসহ বহু দেশে দিনের বেলা লকডাউন; রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা কারফিউ বলবৎ থাকে। আমাদের দেশে গত বছর মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশের কাছে ফোন করলে তালিকা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এতে কিছুটা বিড়ম্বনা থাকলেও প্রয়াসটি ছিল মহৎ ও প্রশংসনীয়। এতে পুলিশের সাথে জনগণের যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, সেটি কমে আসার এবং পুলিশকে মানুষ বন্ধু ভাবার সুযোগ হয়েছিল।

লকডাউনের নিয়ম-কানুন এবং তার প্রয়োগ নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি আছে, যা থেকে অস্থিরতা এবং বাদানুবাদ সৃষ্টি হচ্ছে।

আতঙ্কের মধ্যেই এলো মাহে রামাযান : বাংলাদেশে ২৯ শা'বান চাঁদ দেখা যাওয়ায় ১৪ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে পবিত্র মাহে রামাযান। তবে গত বছরের মতো এবারো করোনা মহামারির আতঙ্কের মধ্যেই শুরু হয়েছে পবিত্র রামাযানের ছিয়াম। বিশ্বজুড়ে প্রায় সব মুসলিম নর-নারী এই মাসে ছিয়াম সাধনায় লিপ্ত হয়ে থাকেন। অফুরন্ত এক আনন্দধারায় তখন সিক্ত হয় সবার জীবন। পবিত্র মাহে রামাযানের পাশাপাশি বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখের দিনটিও শুরু হয়েছে ১৪ এপ্রিল। এই দুঃসময়, এই রোগ-শোক, ভয়-জরা দূরে সরিয়ে রেখেই পবিত্র মাহে রামাযানে ছিয়াম সাধনায় রত হয়েছে মুসলিম বিশ্ব।

করোনার নতুন রূপ : বাংলাদেশে করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। করোনায় প্রতিদিনই মৃত্যুর রেকর্ড হচ্ছে। গত বছরের এপ্রিলে দিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড ছিল ৪৬ জন। সেটা ছাড়িয়ে বর্তমানে ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০ এবং সর্বশেষ ১০০ ছাড়িয়ে গেছে দৈনিক মৃত্যু। করোনাভাইরাসের দক্ষিণ আফ্রিকান ভেরিয়েন্টটি সম্পর্কে উদ্বেগজনক খবর দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। তারা জানিয়েছেন, শিশুরাও এখন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। বমি, খিঁচুনি ও পেট খারাপ হলেই শিশুটি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বলে বোঝা যায়। দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় মৃত্যুতে কিছু পরিবর্তন ধরা পড়েছে রোগতত্ত্ববিদদের কাছে। কম বয়সী ও নারীদের মৃত্যু তুলনামূলক বেশি হতে দেখা যাচ্ছে। করোনায় বাংলাদেশে ১৩৯ চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন। পুলিশ মারা গেছেন ৯০ জন। প্রশাসনের ২৫ কর্মকর্তার মৃত্যু হয়েছে। আর করোনায় সাংবাদিক মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৪ জন।

আগে বয়স্করা সংক্রমিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও এবার কম বয়সীদের হারটাও আশঙ্কাজনক। গত বছর ৮ মার্চ সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর ৯৫ দিনে এক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় ১৫ দিনেই মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে। গত এক বছরে মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১০ হাজার। দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক সংগঠক, রাজনীতিবিদ, সংসদ-সদস্য, চিকিৎসক, সাংবাদিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পুলিশসহ প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এই মৃত্যুর

তালিকায় আছেন। শহরে মৃত্যুর হার বেশি হলেও গ্রামে একেবারে বিস্তৃত হয়নি— তেমন দাবি করা যাবে না।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় বছরের শুরু থেকে বাংলাদেশে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। বাড়ছে মৃত্যু, সঙ্গে থাকছে শঙ্কা। ভাইরাসটির জিনোমে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন, বিয়োজন— মহামারির স্থায়িত্ব নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনি তা চলমান ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনে বড় ধরনের বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে ভাইরাসটির রূপবদল গবেষক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধানদের ভাবিয়ে তুলছে। এরই মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বের হচ্ছে নতুন নতুন গবেষণাপত্র।

করোনাভাইরাসের ভবিষ্যৎ : অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা, করোনাভাইরাস কখনোই দূরীভূত হবে না এবং মানুষকে সেটা মেনে নিয়েই জীবনযাপন করতে হবে। যেমন— ফ্লু বা নিউমোনিয়া দূরীভূত হয়নি, কিন্তু আল্লাহর দয়ায় ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে তার প্রভাব কমে গেছে। প্রতি বছর ফ্লু এবং নিউমোনিয়ায় অনেক বয়স্ক লোকের মৃত্যু হলেও স্বাভাবিক জীবন থেমে থাকেনি। করোনাভাইরাসের বেলায় হয়তো তাই হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

উপসংহার : রোগ-বালাই হয় বিপদ, না হয় পরীক্ষা। মুমিনের জন্য উভয়টিই কল্যাণকর। হয় মহান আল্লাহ এর দ্বারা মুমিনের গুনাহ মাফ করে দেন অথবা তার ছবরের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। তাই মুমিনের এগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছুই নেই। মহান আল্লাহ চাইলে মানুষকে করোনা দিয়েও বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। আবার চাইলে করোনা না দিয়েও মৃত্যু দান করতে পারেন। একমাত্র জীবন দানকারী ও মৃত্যু দানকারী সত্তা তিনিই। আমদের তার উপরই ভরসা রাখা উচিত। নিজ নিজ তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস মযবূত করা উচিত। যাতে আমরা মারা গেলেও যেন সঠিক ঈমানের উপর মারা যেতে পারি। কেননা আজ হোক কাল হোক আমাদের মৃত্যুবরণ করতেই হবে। বেঁচে থাকা সফলতা নয়; ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করতে পারাটা সফলতা। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করুন- আমীন!

‘হারামাইনের মিম্বার থেকে’-এর বাকী অংশ

আর এসবকিছু হতে বুঝা যাচ্ছে যে, তার ইলম, হিকমত, রহমত, পুণ্যতা, মহানুভবতা, অদৃশ্য জানা, ইহকাল-পরকাল ইত্যাদির প্রতি। আর তিনিই তাঁর বান্দদের উপর নিয়ামত দান করে থাকেন।

ঈমানের এই উজ্জ্বল প্রদীপের ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তিন ধরনের–

(১) মৌলিকভাবে ঈমানের আলো হতে বঞ্চিত। এই শ্রেণির লোকেরা ঈমানের আলোকে শুধু অন্ধকার, বজ্র ও বজ্রধ্বনি ছাড়া আর কিছুই দেখে না এবং সে আল্লাহর প্রদর্শিত হেদায়াতকে গ্রহণ করে না, যদিও তার কাছে শরীআতের বিভিন্ন নিদর্শন পেশ করা হয়।

(২) দুর্বল ঈমানের অধিকারী, যারা মূলত তাদের পূর্বপুরুষ ও পূর্ববর্তী আলেমদের রীতি-নীতি অনুসরণ করে চলে। তাদের ব্যাপারে আলী ইবনু ত্বালেব رضي الله عنه বলেন, যারা প্রকৃত হক্বের অনুসারী অথচ তাদের মধ্যে ঈমানের আলো নেই। যদি তারা ঈমানদারদের অনুসরণ করে এবং তাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ না প্রবেশ করে, তাহলে তারা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩) যারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানের আলোর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তারা আদম শ্রেষ্ঠতম সন্তান। যাদের মধ্যে ঈমানের মৌলিক দিকগুলো রয়েছে, যা তাদের ঈমানের আলোর উপর পরিচালিত করছে। আর যদি তাদের নিকট জ্ঞানবিরোধী কিছু পেশ করা হয়, তাহলে তাদের চোখে তা ঘোরতর অন্ধকার রাতের মতো মনে হয়।

পরিশেষে নবীর উপর দরূদ, তাঁর পরিবার, খোলাফায়ে রাশেদীন, সমস্ত মুসলিম-মুসলিমা ও সকল মুসলিম দেশের জন্য দু‘আ এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বদদু‘আ করে তিনি তার খুৎবা সমাপ্ত করেন।

বিদায় রামাযান! অতঃপর...

*-জাবির হোসেন**

বিদায় নিল বহু মাহাত্ম্যপূর্ণ মাস— মাহে রামাযান। রামাযান ছিল রহমত, বরকত ও মাগফিরাতে পূর্ণ এক কল্যাণময় মাস। রামাযান ছিল নিজেকে তাক্বওয়ার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করার মাস। সাহরী, ইফতার, তারাবীহ, লায়লাতুল ক্বদর, ই'তিকাফ ও যাকাতুল ফিত্বর ইত্যাদি ইবাদতে পূর্ণ এক মহান মাস ছিল এটি।

দেখতে দেখতে এক বছর পর পুনরায় রামাযান মাস এসে উপস্থিত হয়েছিল। মুসলিম সমাজ নতুন চাঁদ দেখে মাহে রামাযানকে স্বাগত জানিয়েছিল। এক মাস ছিয়ামব্রত পালন করে মুমিন-মুসলিমগণ আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়ন এবং তাক্বওয়া অর্জনের নিয়্যত করেছিল। এক বছর পর আবার এই রামাযান মাস পাওয়া না পাওয়ার চিন্তায় অনেকে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল।

সত্যিই মুমিন মুসলিমদের নিকট রামাযান মাস বড় আনন্দের মাস। আর আনন্দের হবেই বা না কেন? কেননা এই মাসে মহান স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যে কুরআন মানবতার মুক্তির মহাসনদ। যে কুরআন মুমিনদের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। যে মাস রহমত, বরকত ও মাগফিরাতে ভরা। নইলে চিন্তা করুন তো, কীভাবে একজন মানুষ আনন্দের সহিত ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে পারে। ছিয়াম উপলক্ষ্য ব্যতীত যেটা থাকা অত্যন্ত মুশকিল।

কিন্তু এই মাস তো বিদায় নিল। এখন কী হবে? আমাদের ইবাদতের যে স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা কি কমে যাবে? আমরা যে ইবাদতে অভ্যস্ত হয়েছি, তা কি বন্ধ হয়ে যাবে? রামাযান তো বিদায় নিল, কিন্তু আমরা কি এই মাস থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করব না?

মুমিনগণ শুধু এক মাস মহান আল্লাহর ইবাদত পালন করে না; তারা রামাযান মাসে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন এবং ইবাদতের যে চর্চা করেছে, রামাযানের বাইরেও সেই মহান আল্লাহকে খুশী করার জন্য বাকী ১১ মাস ইবাদত পালন অব্যহত রাখবে।

রামাযান মাসকে আমরা ইবাদত পালনের জন্য প্রশিক্ষণকালীন সময়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এক মাস প্রশিক্ষণের প্রতিফলন বাকী মাসগুলোতে দেখা যাবে— এটাই কাম্য। উদাহরণস্বরূপ— সেনাবাহিনীতে যোগদানের পর প্রত্যেক আর্মি অফিসারকে একটি নির্দিষ্ট সময় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হয়। সেখানে তাকে সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, নেতার আনুগত্য, অস্ত্রচালনা, শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নিজের এবং দেশ রক্ষার কৌশল তাকে শেখানো হয়।

এই রকম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোনো আর্মি আফিসার যদি দেশের সীমান্তে শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই না করে জুয়া, মদ, গাঁজা, গান, বাজনা আর নারী বাজিতে মত্ত থাকে আর শত্রুপক্ষের গুলির বিরুদ্ধে নিজের অস্ত্র প্রয়োগ না করে মারা যায়, তাহলে তাকে কী বলা হবে?

—'বেওকুফ'।

'হ্যাঁ, তাকে বেওকুফই বলা হবে'।

নিজের জীবন ও দেশ রক্ষার জন্য সরকার তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। যদি সে ঐ অস্ত্র সঠিকভাবে প্রয়োগ করে মারা যেত, তাহলে সে শহীদের মর্যাদা পেত। আর যদি সে সাফল্য লাভ করত, তাহলে সে গাজী বা বিজয়ী যোদ্ধার মর্যাদা পেত। সর্বাবস্থায় সে সফল তথা উভয় অবস্থাই তার জন্য মর্যাদার। কারণ বাঁচলে গাজী আর মরলে শহীদ।

অনুরূপ স্রষ্টার ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য রামাযান মাস হলো আমাদের জন্য প্রশিক্ষণকালীন সময়। আমাদের শত্রু শয়তানকে বন্দী রেখে তার বিরুদ্ধে কীভাবে সফল হওয়া যাবে, তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এই সময়ে। প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা পানাহার ও যৌনকর্মসহ যাবতীয় হারাম কাজ থেকে বিরত থেকে সে (একজন মুমিন) সংযমের এমন প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে, যা ১১ মাসব্যাপী শয়তানের হাজারো প্রলোভনে প্রতারিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। শয়তানের যে কোনো কুমন্ত্রণাকে প্রতিহত করা তার জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে। সে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টিকর্তার ইবাদতে মশগূল থাকবে। শয়তানকে প্রতিহত করার মোক্ষম অস্ত্র হলো তাক্বওয়া; আর সেটাই ছিয়াম পালনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমনটি কুরআনে

* এম. এ. (অধ্যয়নরত), বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

বলা হয়েছে, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের উপরও ছিয়াম অপরিহার্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত করা হলো, যেন তোমরা তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করতে পারো' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাক্বওয়া কী? সাধারণ অর্থে আল্লাহভীতিকে তাক্বওয়া বলা হয়। হারাম কাজ পরিত্যাগ করার আরেক নাম হচ্ছে তাক্বওয়া। ব্যাপক অর্থে, তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশিত বিষয় বাস্তবায়ন করা, তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা।[১] অথবা বলা যায়, পরকালীন জীবনের জন্য ক্ষতিকারক যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার নাম তাক্বওয়া।

একদা উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিকট তাক্বওয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আপনি কি কখনো এমন পথ অতিক্রম করেছেন, যেটি খুবই কণ্টকাকীর্ণ এবং যার দুই দিকই কাঁটাযুক্ত গাছ দ্বারা আচ্ছাদিত? তদুত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু তখন বললেন, এমতাবস্থায় আপনি কীভাবে পথ অতিক্রম করেছেন? জবাবে উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, কাপড় ও শরীর বাঁচিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে পথ আমি অতিক্রম করেছি। উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, এটাই তাক্বওয়া।[২]

যার হৃদয়ে তাক্বওয়া যত বেশি, তার আখলাক, আমল তত বেশি স্বচ্ছ। যার হৃদয় তাক্বওয়াশূন্য তার হৃদয় শয়তানের ঘাঁটি। সুতরাং যে অস্ত্র দ্বারা শয়তানকে প্রতিহত করা যায়, সেই অস্ত্রের প্রশিক্ষণ যেহেতু রামাযান মাসে হয়ে থাকে, তাই বাকী ১১ মাসে নিজেকে রক্ষা করতে সেই অস্ত্রের (তাকওয়া) ব্যবহার করতে হবে। শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয় লাভ করতে হবে। তাক্বওয়া প্রতিফলন ঘটাতে হবে নিজেদের জীবনে।

মুমিনের ইবাদত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে। মহান আল্লাহর ঘোষণা, ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ 'মৃত্যু আসা অবধি তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকো' *(আল-হিজর, ১৫/৯৯)*। তাই রামাযান বিদায় নিলেও বহু সুন্নাহসম্বলিত নেক আমল সম্পাদনের সুযোগ অবারিত থাকে। আমাদের উচিত, রামাযানে যে সমস্ত আমলে অভ্যস্ত হয়েছি, বাকী ১১ মাসেও তা চলমান রাখা।

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বর্ণনা করেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কী? তিনি বললেন, أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ 'যে আমল সর্বদা সম্পাদন করা হয় (তা উত্তম), যদিও তা (পরিমাণে বা সংখ্যায়) অল্প হয়'।[৩]

প্রিয় পাঠক! আমরা প্রভুর সন্তুষ্টির নিমিত্তে এক মাস ছিয়াম পালন করেছি। এখন রামাযান মাস বিদায় নিয়েছে। এখন আমাদের করণীয় কী?

আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে আদেশ করেছেন, তাঁকে ভয় করার। হ্যাঁ, আমরা তো তাঁকে ভয় করেছি। তাই তো ছিয়ামরত অবস্থায় লুকিয়ে এক ঢোক পানিও পান করিনি। আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে এইভাবে সারা বছর তথা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভয় করতে পারব না? হ্যাঁ, আমরা পারব। আমাদেরকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইবাদত করে যেতে হবে। যেমনভাবে আমরা এই এক মাস করেছি। কেননা এটিই আমাদের প্রভুর নির্দেশ।

আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে আদেশ করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করার। আমারা কি পারব না, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত সময়মতো আদায় করতে? —হ্যাঁ, আমরা পারব। আমাদের মধ্যে সেই যোগ্যতা আছে। যদি না পারি, তাহলে এই এক মাস কীভাবে পেরেছি? কোন শক্তি আমাদেরকে বাধ্য করেছিল এই এক মাস? হাদীছে এসেছে, জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ '(মুমিন) বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো ছালাত ত্যাগ করা'।[৪]

রামাযান মাস হলো পবিত্র কুরআন নাযিলের মাস। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ 'রামাযান হলো সেই মাস, যেই মাসে নাযিল করা হয়েছে কুরআন। যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সৎ পথের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। এই কুরআন পড়তে ও মেনে চলতে আদেশ করেছেন— আমাদের প্রতিপালক। আমরা কি পারব না, সারা বছর কুরআনের অনুশীলন করতে? —হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা পারব। কারণ, এই এক মাসে নিশ্চয় এক বার কুরআন পড়া

---

১. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী ও আব্দুল্লাহ আল-কাফী, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), পৃ. ৫০৫।

২. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/৭৫।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬৫।

৪. সুনানে তিরমিযী, হা/২৬২০, ছহীহ লিগয়রিহী।

শেষ করেছি অথবা কিছু তো পড়েছি। তাহলে বাকী ১১ মাস কেন পারব না বলুন তো? হাদীছে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ 'আল্লাহ তাআলার কিতাবের যে ব্যক্তি একটি হরফ পাঠ করবে, সে তার জন্য এর ছওয়াব পাবে। আর ছওয়াব হবে ১০ গুণ। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ'।[৫]

আমরা তো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মিস করি না। প্রতিপালকের খুশী অর্জনের জন্য আমাদেরকে নফল ছালাত আদায়েরও বিধান দেওয়া হয়েছে— যাতে করে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নফল ছালাতের মধ্যে উত্তম হলো তাহাজ্জুদের ছালাত। হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ 'রামাযান মাসের ছিয়ামের পর সর্বোৎকৃষ্ট ছিয়াম হলো আল্লাহ তাআলার মুহাররম মাসের ছিয়াম আর ফরয ছালাতের পর সর্বোৎকৃষ্ট ছালাত হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) ছালাত'।[৬] আমরা কি পারব না, আরো নফল ছালাত আদায় করতে? —হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই পারব। আমরা তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে পারব। এক মাস তারাবীহ পড়ে আমাদের মধ্যে সেই যোগ্যতা তৈরি হয়েছে। তাহলে রামাযান শেষ হয়েছে বলে, কেন তাহাজ্জুদকে গুরুত্ব দিচ্ছি না?

রামাযান মাস ঠিকই বিদায় নিয়েছে। কিন্তু ছিয়ামের সকল বিধান বিদায় নেয়নি। রামাযানের বিদায়ের পরও সুন্নাত ও নফল ছিয়ামের বিধান বিদ্যমান আছে। তার মধ্যে নিম্নে বর্ণিতগুলো অন্যতম-

(১) আশূরায়ে মুহাররমের ছিয়াম : আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ 'আশূরার ছিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট আমি আশা পোষণ করি যে, তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের (গুনাহ) ক্ষমা করে দিবেন'।[৭]

৫. সুনানে তিরমিযী, হা/২৯১০, ছহীহ।
৬. সুনানে তিরমিযী, হা/৪৩৮, ছহীহ।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২, ।

(২) শা'বান মাসের ছিয়াম : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ 'নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোনো মাসে এত বেশি (নফল) ছিয়াম রাখতেন না। তিনি শা'বান মাসের (প্রায়) পুরোটাই ছিয়াম রাখতেন'।[৮] উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে শা'বান মাসে যে পরিমাণ ছিয়াম পালন করতে দেখি, (বছরের) অন্য কোনো মাসে সে পরিমাণ ছিয়াম পালন করতে দেখি না। তিনি বললেন, 'শা'বান মাস রজব এবং রামাযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যে মাসের (গুরুত্ব সম্পর্কে) খবর মানুষ রাখে না, অথচ এ মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আমলনামা উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমলনামা আল্লাহ তাআলার নিকটে এমন অবস্থায় উত্তোলন করা হোক, যখন আমি ছিয়াম পালনরত আবস্থায় আছি'।[৯]

(৩) শাওয়াল মাসের ছিয়াম : আবূ আইয়ূব আনছারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করল, অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয় দিন ছিয়াম পালন করল, সে যেন সম্পূর্ণ বছরই ছিয়াম পালন করল'।[১০]

(৪) আরাফার দিনের ছিয়াম : আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ 'আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আরাফাতের দিনের ছিয়াম সম্পর্কে আশা করি যে, তিনি (এর মাধ্যমে) পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন'।[১১]

(৫) সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ 'নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়ামের প্রতি অধিক যত্নসহকারে খেয়াল রাখতেন।[১২]

৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৭০।
৯. সুনানে নাসাঈ, হা/২৩৫৭, হাসান।
১০. সুনানে তিরমিযী, হা/৭৫৯, হাসান-ছহীহ।
১১. সুনানে তিরমিযী, হা/৭৪৯, ছহীহ।
১২. সুনানে তিরমিযী, হা/৭৪৫, ছহীহ।

(৬) আইয়ামুল বীযের ছিয়াম : আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ 'হে আবু যার! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করতে চাও, তবে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ ছিয়াম পালন করো'।[১৩] অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছরই ছিয়াম পালন করল। এর সমর্থনে আল-কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি একটি ছওয়াবের কাজ করে, তাহলে তার প্রতিদান হচ্ছে এর ১০ গুণ' *(আল-আনআম, ৬/১৬০)*। সুতরাং এক দিন ১০ দিনের সমান।[১৪]

আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ঝগড়া করতে নিষেধ করেছেন। আমরা কি পারব না সারা বছর এ থেকে বেঁচে থাকতে? হ্যাঁ, আমরা সারা বছর এ থেকে বিরত থাকতে পারব, যেমনভাবে ছিয়ামরত অবস্থায় কেউ ঝগড়া করতে এলে আমরা বলেছি, 'আমি ছিয়াম রেখেছি'। ঠিক এইভাবেই আমরা পারব।

আমরা দান-ছাদাক্বা করার জন্য রামাযান মাসকে বেছে নিয়েছিলাম। রামাযান শেষে যাকাতুল ফিত্বরও আদায় করেছি। কিন্তু দান-ছাদাক্বা শুধু রামাযান মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; রামাযানের বাইরেও দান-ছাদাক্বা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا 'প্রতিদিন বান্দা যখন সকাল করে, তখন দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করে; তাদের একজন বলে, হে আল্লাহ! দানকারীকে উত্তম প্রতিদান দাও আর অপরজন বলে, হে আল্লাহ! কৃপণের (সম্পদকে) ধ্বংস করে দাও'।[১৫]

আমাদের জন্য এই মাসে শয়তানকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এখন কিন্তু তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে শয়তানের আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ 'হে মুমিনগণ, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(আল-বাক্বারা, ২/২০৮)*। আমরা কি পারব না, শয়তানকে হারাতে? —হ্যাঁ, আমরা পারব। আমরা শয়তানের গোলামী করতে বাধ্য নই। আমাদেরকে যদি শয়তানকে হারাতে হয়, তবে তাকে চিনতে হবে। জানতে হবে তার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। শিখতে হবে আত্মরক্ষার কৌশল।

শয়তান আমাদেরকে হারানোর জন্য পি-এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেছে। কিন্তু শয়তানের মোকাবিলার জন্য আমাদের নিকট প্রাথমিক স্তরের পাঠও নেই। কিন্ত আমরা চাইলে কত সহজে তাকে পরাজিত করতে পারি। চিন্তা করুণ হে পাঠক! শয়তানের কৌশল কত বড় দুর্বল। মাকড়সার জালের সদৃশ। তাক্বওয়া অবলম্বন করলেই আমরা শয়তানকে পরাস্ত করতে পারব।

প্রিয় বন্ধু! জেনে রাখুন, নেক আমল বা সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ হলো, আমলকারী ওই কর্মের পরে পুনরায় অন্যান্য সৎকর্ম চলমান রাখবে। সুতরাং রামাযানের পর আমাদের অন্যান্য নেক আমল করতে থাকা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, আমাদের ছিয়াম ও তারাবীহ মহান আল্লাহ কবুল হয়েছে। আর হ্যাঁ, আমরা কখনোই পুনরায় আমাদের সেই অবস্থায় ফিরে যাবে না, যে অবস্থায় ছিলাম রামাযানের পূর্বে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সে নারীর মতো হয়ো না, যে তার সুতা মযবূত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে নষ্ট করে দেয়' *(আল-কুরআন ১৬/৯২)*।[১৬]

বন্ধুগণ! একদিন আমাদের মরতেই হবে— আমরা চাই বা না চাই। এটাই রবের বিধান। মৃত্যুর পরবর্তী দিনগুলোতে আমরা শান্তি চাই কি চাই না? যদি শান্তি চাই, তাহলে আমাদের শান্তির পথে হাঁটতে হবে। তবেই আমরা সেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারব। নতুবা তখন 'হায় হায়' করতে হবে, আর বলতে হবে, হায়! আমি যদি আগে কিছু সৎ আমল প্রেরণ করতাম। হায়! আমি যদি দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেতাম।

না, বন্ধু না! দ্বিতীয় চান্স নেই। জীবন একবার। মৃত্যু একবার। পরকালের জীবন অনন্তকালের। বন্ধু! আমাদের চিন্তার খোরাক এখানে আছে। রামাযানের শিক্ষা প্রতিফলিত হোক আমাদের জীবনে। এখন আমরা ভেবে দেখি— বিদায় রামাযান! অতঃপর...।

---

১৩. সুনানে তিরমিযী, হা/৭৬১, হাসান-ছহীহ।

১৪. সুনানে তিরমিযী, হা/৭৬২, ছহীহ।

১৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৪২।

১৬. আব্দুল হামীদ মাদানী, রমযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল (তাওহীদ প্রকাশনী-বর্ধমান), পৃ. ১৫০।

গ্রন্থ পরিচিতি-১১ : সুনানু আবী দাঊদ

*-আল-ইতিছাম ডেস্ক**

ভূমিকা : হাদীছের খেদমতে আমাদের পূর্বসূরী মহান ইমামদের যে অবদান, তা কখনো ভুলার নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা মুসলিমরা বিভিন্ন উপন্যাস, গল্প গ্রন্থের নাম ও বিবরণ জানলেও হাদীছের গ্রন্থাবলি সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানও রাখি না। মুসলিম জাতির অধঃপতনের জন্য এর চাইতে বড় কারণ আর কী হতে পারে? যেখানে কুরআন-হাদীছের বই মুসলিমদের ঘরে ঘরে থাকার কথা, সেখানে তৎপরিবর্তে রয়েছে দুনিয়াবী রাজনীতির বই, কল্প-কাহিনী, উপন্যাস ও দুনিয়া অর্জনের সহায়ক বিভিন্ন বই। যেখানে কুরআন-হাদীছের লাইব্রেরি থাকার কথা সেখানে, টিভি, ফ্রিজ, হরেক রকম আসবাবপত্র পুরো ঘর দখল করে আছে। যাহোক, এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ইমাম আবূ দাঊদ রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত বিস্ময়কর গ্রন্থ 'সুনানু আবী দাঊদ'। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো।-

নাম : সুনানু আবী দাঊদ (سنن أبي داود) এটি মাঝারি কলেবরের হাদীছের গ্রন্থ।

'সুনান' নামের অর্থ : এটি সুনান গ্রন্থ। সুনান হলো, যে সকল গ্রন্থে 'কিতাবুত ত্বহারাত' হতে শুরু করে 'কিতাবুল ওয়াছায়া' পর্যন্ত আহকাম সংক্রান্ত হাদীছগুলো ফিক্বহী ধারাবাহিকতায় সংকলন করা হয়।

সংকলনকাল : ইমাম আবূ দাঊদ প্রায় ২০ বছর যাবৎ দক্ষিণ তুরস্কের ত্রিপোলির অন্তর্গত তরসূস এলাকায় বসবাস করেছিলেন। সে সময়ে তিনি এ গ্রন্থটি সংকলন করেন। সংকলন সমাপ্ত হলে তিনি স্বীয় গ্রন্থটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখালে তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ইমাম বুখারী ১৬ বছর, ইমাম মুসলিম ১৫ বছর ও আবূ দাঊদের ২০ বছর যাবৎ গ্রন্থ সংকলনে ব্যয় করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের তাক্বওয়াবান ইমামগণ অত্যন্ত ছবরের সাথে ও নিখুঁত করার নিয়্যতে ধীরে-সুস্থে গ্রন্থ সংকলন করতেন। তারা এসব কাজে তাড়াহুড়া করতেন না।

বিবরণ : মাঝারি কলেবরের এই গ্রন্থটিতে হাদীছ রয়েছে ৫২৭৪টি। মোট ৩৬টি কিতাব (অধ্যায়) ও ১৮৭১টি বাব (পরিচ্ছেদ) রয়েছে। লেখক ইমাম আবূ দাঊদ রাহিমাহুল্লাহ এটি ফিক্বহী ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে সংকলন করেছেন। তিনি প্রতিটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম রচনা করেছেন। অতঃপর শিরোনামের সাথে উপযোগী হাদীছসমূহ সন্নিবেশ করেছেন। তিনি প্রতিটি হাদীছ সনদসহ উল্লেখ করেছেন। একটি বিষয়ে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন হাদীছ পেশ করেছেন। এছাড়াও মাঝে মাঝে হাদীছের সনদে ও মতনে থাকা ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করেছেন। কতিপয় স্থানে তিনি রাবীদের ব্যাপারে রায় বা মতামত প্রদান করেছেন। হাদীছের যে অংশটুকু দিয়ে মাসআলা প্রমাণ করা যায়, তিনি সে অংশটুকুই বর্ণনা করেছেন। অসংখ্য হাদীছ তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন যেন বুঝতে সহজ হয়। গ্রন্থটি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের পরই অবস্থান পেয়েছে। সুনানে আরবা'আ-এর মধ্যে আবূ দাঊদ সর্বাগ্রে রয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ রাহিমাহুল্লাহ এ গ্রন্থে শুধুই ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করবেন মর্মে কোনোরূপ শর্তারোপ করেননি। তিনি ছহীহ, যঈফ, হাসান সব হাদীছই বর্ণনা করেছেন।

ফিক্বহী ক্রমধারা অনুসরণপূর্বক উছূলের আলোকে হাদীছ উদ্ধৃতকরণের যে পদ্ধতি এতে অবলম্বন করা হয়েছে, তার কোনো নযীর পূর্বে ছিল না। ফিক্বহের জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী ব্যক্তির সুনানু আবী দাঊদ ভালোভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। ইমাম সাখাবী ফাতহুল মুগীছ গ্রন্থে অনুরূপ বলেছেন।

উল্লেখ্য, ইমাম আবূ দাঊদ রাহিমাহুল্লাহ রচিত এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে ফিক্বহী মাসআলা, হাদীছের অনেক বিষয়েই প্রভূত জ্ঞান হাছিল হবে।

গ্রন্থকারের পরিচয় : এই মহান গ্রন্থটির সংকলক হলেন, ইমাম আবূ দাঊদ রাহিমাহুল্লাহ। তার পুরো নাম হলো, سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني সুলায়মান ইবনুল আশআছ ইবনে ইসহাক্ব ইবনে বাশীর ইবনে শাদ্দাদ আল-আযদী আস-সিজিস্তানী। তার উপনাম হলো আবূ দাঊদ।[১] তিনি ২০২ হিজরী মোতাবেক ঈসায়ী ৮১৭ সনে খলীফা মামূনের শাসনামলে জন্মলাভ করেন।[২] তিনি হাদীছের সন্ধানে ইরাক, খুরাসান, মিসর, হিজায, শামসহ অনেক দেশ ভ্রমণ করেন।[৩] তিনি বাছরাতে বসবাস করতেন। অসংখ্যবার বাগদাদে গিয়েছিলেন।[৪]

---

১. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৫৩৩।
২. তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৯৮।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত।

www.al-itisam.com

উস্তাযগণ : তিনি অসংখ্য উস্তায হতে ইলম হাছিল করেছেন। যেমন আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল, আবূ সালামা আত-তাবূযাকী, আবুল ওয়ালীদ আত-ত্বয়ালিসী, মুহাম্মাদ ইবনু কাছীর আল-আবদী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।[৫]

ছাত্রগণ : আবূ ঈসা আত-তিরমিযী, আবূ আব্দুর রহমান আন-নাসাঈ, আবূ আলী মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু আমর, আবুত তাইয়েব আহমাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান আল-আশনানী, আবূ উবায়েদ মুহাম্মাদ আল-আজুররী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ মাতার রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

তার সম্পর্কে ইমামদের মূল্যায়ন :

(১) ইমাম ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, أبو داود ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء من الحادية عشرة 'ইমাম আবূ দাঊদ একজন ছিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য), হাদীছের হাফেয, সুনানে আবূ দাঊদ ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি বর্ষীয়ান আলেম ছিলেন। তিনি ১১তম স্তরভুক্ত।[৬]

এছাড়াও ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে অসংখ্য ইমামের প্রশংসাবাণী স্বীয় তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৭]

(২) ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, الإمَامُ شَيْخُ السُّنَّةِ مُقَدَّمُ الحُفَّاظِ أَبُو دَاوُدَ الأَزْدِيُّ السِّجِسْتَانِيُّ مُحَدِّثُ البَصْرَةِ 'তিনি একজন ইমাম, সুন্নাহ-এর শায়েখ, হাদীছের হাফেযদের অগ্রসেনানী, বাছরার মুহাদ্দিছ'।[৮]

গ্রন্থসমূহ : তিনি সুনান আবূ দাঊদ ছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংকলন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। যেমন- রিসালাতু আবী দাঊদ ইলা আহলি মাক্কা, আয-যুহদ, আন-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ, আল-ইখওয়াতু ওয়াল-আখাওয়াত, মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, দালায়েলুন নবুঅত, আত-তাফাররুদ ফিস সুনান, কিতাবুল মারাসীল ইত্যাদি।

মৃত্যু : তিনি ২৭৫ হিজরী মোতাবেক ঈসায়ী ৮৮৮ সনে ৭৩ বছর বয়সে মারা যান।[৯] আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন- আমীন।

---

৫. প্রাগুক্ত।

৬. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৫৩৩।

৭. তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৯৮।

৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা, রাবী নং ১১৭।

৯. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৫৩৩।

'ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা' প্রবন্ধটির বাকী অংশ

আর সুন্নাহ অনুসারে তখনই ফয়সালা করা যাবে, যখন তা আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যাবে না। রায় ও বিবেক-বুদ্ধির ক্ষেত্রে যদিও এটা উলামায়ে কেরামের নিকট সঠিক। কেননা তাঁরা বলে থাকেন যে, হাদীছ এসে গেলে সব ধরনের রায় ও ক্বিয়াস বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু সুন্নাহর ক্ষেত্রে এটা সঠিক নয়। কারণ সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এবং তার অর্থ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে। তাই কোনো বিধান সম্পর্কে যদি মনে হয় এটি কুরআনে আছে, তা সত্ত্বেও সুন্নাহতে সেই বিধান সম্পর্কে অনুসন্ধান করা জরুরী। কুরআনের সাথে সুন্নাহর যে সম্পর্ক, রায় বা ক্বিয়াসের সাথে সুন্নাহর সে সম্পর্ক হতে পারে না। কখনই না, কখনই না। বরং কুরআন ও সুন্নাহকে একটিই উৎস মনে করতে হবে। এ দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। যেমন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমাকে কুরআন ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু দেওয়া হয়েছে'। অর্থাৎ সুন্নাহ। তিনি আরো বলেন, 'এ দুটি কখনো আলাদা হবে না, কাওছার নামক ঝর্ণায় আমার সাথে একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত' *(মুসনাদে আহমাদ, হা/১১০৪; তিরমিযী, হা/৩৭৮৮; হাকেম, হা/৩১৯; মুসনাদুল বাযযার, হা/৮৯৯৩; আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, সিলসিলা ছহীহা, হা/১৭৫০)*।

তাই উপরে বর্ণিত শ্রেণি বিভাগটি সঠিক নয়। কেননা এই শ্রেণি বিভাগের দাবি হলো, কুরআন ও সুন্নাহকে আলাদা করা। আর এটাই হচ্ছে বাতিল।

নারীমুক্তির অগ্রদূত : বিশ্বনবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম

-মুহাম্মাদ দিদার বিন আজাহার*

সর্বশক্তিমান আল্লাহ ধরিত্রীর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে যুগলবন্দী করিয়া পাঠাইয়াছেন। অপরূপ মেলবন্ধনে সাজাইয়াছেন এই বসুধা। যুগ থেকে যুগান্তর তথা কিয়ামত পর্যন্ত ক্রন্দসীকে সবুজ-শ্যামল প্রাণবন্ত রাখিবার কি কৌশলই না গ্রহণ করিয়াছেন! বৈপরীত্যের আকর্ষণ দিয়া ধরণীতে বসবাসের উপয়ান্তর দেখাইয়াছেন। তাঁহারই প্রয়াসে সৃষ্টি করিয়াছেন নর-নারী। স্রষ্টা যেন এই সংসারকে টিকাইয়া রাখিবার নিমিত্তেই নারীকে এক অপরিহার্য নিয়ামক হিসেবে ধরাধামে রাখিয়াছেন; সমুন্নত রাখিয়াছেন তাহার অধিকার। প্রতিপালক বলিয়াছেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ 'ওহে মানবকুল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এক নফস হইতে। আর তাহা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ভার্যাকে এবং তাহাদের হইতে ছড়াইয়া দিয়াছেন অসংখ্য মানব-মানবী' *(আন-নিসা, ৪/১)*। মহান প্রভু আরও ঘোষণা করিলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ 'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হইতে সৃজিয়াছি এবং বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে পরিচয়দান করিতে পারো' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*। রব্বে কারীম মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নিসা নামে সূরাও অবতীর্ণ করিয়াছেন। তিনি কি শুধু এতেই ক্ষান্ত হইয়াছেন! ৫৭ বার 'নিসা' এবং ২৬ বার 'ইমরাআ' শব্দবন্ধ ব্যবহার করিয়া নারীর গুরুত্বই যেন অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছেন। মহাকবিগণ কি তাহার ব্যত্যয় ঘটাইবার সাহস করিয়াছেন?

'বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'।

এই অমোঘ বাণীকে অস্বীকার করিবার দুঃসাহস কি কেউ দেখাইয়াছে? এই মহাসত্যকে অস্বীকার করা মানে মানবজাতিকে অস্বীকার করা; স্রষ্টার বিধানকে অস্বীকার করা। আর যাহারা নারীর এই সমুন্নত অভিখ্যা স্বহস্তে কুক্ষিগত করিতে চায় এবং তাহার ভূয়সী মর্যাদাকে করে ভূলুণ্ঠিত, তাহাদের কি মানব বলিবার অবকাশ থাকে? তাহাদের বর্বর, নরাধম, বর্ণচোরা, বিড়ালতপস্বী কি বলিয়া সম্বোধন করিলে তাহাদের হক্কের যথার্থতা আদায় হইবে তাহা খুঁজিয়া পাওয়াই ভার! যেথায় জীবন্ত মেয়েশিশুকে হত্যার নিমিত্তে জন্মেছিল কতশত দানব; যেইখানে পণ্ডিতমূর্খ কংস মামারা মেয়ে জন্মের সংবাদকে দুঃসংবাদ মনে করিয়া অসহনীয় মনস্তাপে চেহারা মলিন করিতো এবং জ্ঞানপাপীরা গান্তকামী হইয়া জুগুপ্সার নিমিত্তে নিজ সম্প্রদায় হইতে লুকাইয়া বেড়াইতো। তেমনি এক ক্ষণকালে যদি কেহ সেই পণ্যতুল্য রমণীদের মৃতকল্প মর্যাদাকে পুনর্জন্ম দিয়া পুরুষের পৌরুষ থেকে দেয় তিনগুণ মর্তবা তাহা হইলে কেমন হইবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ?

হ্যাঁ, যিনি মাহিন্দ্রক্ষণে আলোকবর্তিকা হইয়া আবির্ভূত হইলেন তিনিই বসুমতীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, নবীগণের সর্দার, সারা জাহানের রহমত, মহানবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তমিস্রাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা হইতে ন্যায়ের ঝাণ্ডা লইয়া নারীমুক্তির অগ্রদূত হইয়া যেন চোখের পলকে দারুণ ঝলকে প্লবগতিতে অদৃষ্টপূর্ব সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া সত্যের মশাল হস্তে উদিত হইলেন। আগমন করিলেন নারীমুক্তির অগ্রদূত বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম। মেয়েশিশুদের বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করিলেন। বলিলেন, 'কাহারো যদি একজন দুহিতা থাকে এবং সে তাহাকে হত্যা করেনি কোনো প্রকার অবহেলা করেনি এবং আত্মোদ্ভবকে দুহিতার উপর প্রাধান্য দেয়নি; তাহা হইলে আল্লাহ তাহাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন'।[১] তিনি আরও আজ্ঞপ্তি প্রদান করিলেন, 'তোমরা রমণীদের অত্যুৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করিবে (উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করিবে)'।[২] সমতার এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিলেন, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর অবশ্য কর্তব্য'।[৩] এ যেন স্বপ্নলোকের বাস্তবনমুনা, যাহার কল্পনাই ছিলো দুরূহ ব্যাপার; তাহাই যেন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়া পরিস্ফুটিত হইল আয়েশা ছিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর মাধ্যমে।

* শিক্ষার্থী, একাউন্টটিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস (AIS) বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৩।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৩১।
৩. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪।

যিনি ২ হাজার ২১০টি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা হাদীছশাস্ত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। যেইখানে নারীর অস্তিত্বই ছিল সংকটাপন্ন, সেইখানে নারীকে শিক্ষার অধিকার দেওয়া হইলো।

ইবাদত-বন্দেগী ও প্রভুর নৈকট্য লাভেও মানব ও মানবীকে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ভামিনীদের সেই কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেই কাজের আদেশ মনুষ্যদেরও দেওয়া হইয়াছে। কিয়ামত দিবসে তাহাদের কাহারো সহিত কোনো প্রকার বৈষম্য করা হইবে না। রব্বুল আলামীন ঘোষণা করিলেন,

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

'নিশ্চয়ই মুসলিম নর-নারী, মুমিন নর-নারী, অনুগত নর-নারী, সত্যবাদী নর-নারী, ধৈর্যশীল নর-নারী, বিনয়াবনত নর-নারী, দানশীল নর-নারী, ছিয়ামপালনকারী নর-নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী নর-নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নর-নারী, তাহাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন' *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৫)*।

বিধানদাতা সম্পত্তিতেও পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উত্তরাধিকারিণী বানাইয়াছেন। ঘোষণা করিয়াছেন সেই অমোঘ সত্য বাণী, ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ 'নরদের জন্য জনক-জনিকা ও নিকটাত্মীয়রা যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে একটি অংশ রহিয়াছে। আর নারীদের জন্য রহিয়াছে জনক-জনিকা ও নিকটাত্মীয়রা যাহা রাখিয়া গিয়াছে, উহা কম হোক কিংবা বেশি হোক তাহা হইতে নির্ধারিত হারে একটি অংশ' *(আন-নিসা, ৪/৭)*। শুধু কি পিতার সম্পত্তিতে নারীকে অংশীদার সাব্যস্ত করা হইয়াছে? না! পিতৃব্য, জননী, সৃষ্টিকর্তা এমনকি দারকের বৈভবেও জনয়িত্রীর অধিকার সমুন্নত রাখিয়াছেন। বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আরও ফরমাইলেন, ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ 'তোমাদের পুরুষেরা যাহা উপার্জন করিবে, তাহা পুরুষদের থাকিবে আর যাহা নারীরা উপার্জন করিবে, তাহা নারীদেরই থাকিবে' *(আন-নিসা, ৪/৩২)*।

স্পষ্ট নির্দেশ আসিল, ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ 'অতঃপর ছালাত শেষ হইলে তোমরা জমিনে ছড়াইয়া পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অন্বেষণ করো' *(আল-জুমআ, ৬২/১০)*। যেই যুগে নারীদেরকে মানব জ্ঞানই করা হইতো না, সেইখানে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের ঘোষণা কি সাধারণ কোনো ঘোষণা হইতে পারে? এ কি বিংশ শতাব্দীর ক্লারা জেটকিনের ঘোষণা? আর যিনি এই ঘোষণা বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহাকে নারীমুক্তির অগ্রদূত বলিলেও কি নেহাতই কম বলা হইবে না? হ্যাঁ! তিনিই সেই ক্ষণজন্মা পুরুষ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যিনি বহুমাত্রিকতায় নারীকে চিত্রিত করিয়াছেন; সিক্ত করিয়াছেন মাতৃকা হিসেবে, ভগিনী হিসেবে, নন্দিনী হিসেবে, জায়া হিসেবে; ঘোষণা করিয়াছেন ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা ও অধিকার।

প্রজনিকা হিসেবে নারীকে দেওয়া হইয়াছে আকাশচুম্বী সম্মান। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'প্রসূতির চরণতলে অপত্যের জান্নাত'।[৪] জনিকার অধিকার সম্পর্কে করুণাময় আল্লাহ বলিয়াছেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

'আর তোমার পালনকর্তা আজ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তোমরা তাহাকে ছাড়া অন্য কাহারো উপাসনা করিবে না এবং জনক-জনিকার সহিত সদাচরণ করিবে। তাহাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাহাদের 'উফ' বলিও না এবং তাহাদের ধমকও দিও না। আর তাহাদের সহিত সম্মানজনক কথা বলিও। আর তাহাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হইয়া ডানা নত করিয়া দাও এবং বলো, হে আমার রব! তাহাদের প্রতি কৃপা করুন, যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/২৩-২৪)*। একবার জনৈক ছাহাবী মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বেশি ভালো ব্যবহারের উপযুক্ত কে? তিনি বলিলেন, তোমার মা, লোকটি বলিলেন, তারপর কে? তিনি বলিলেন, তোমার মা, লোকটি আবারো বলিলেন, তারপর কে? তিনি এবারও বলিলেন, তোমার মা।

৪. নাসাঈ, হা/৩১০৪।

লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞাসিলে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার বাবা'।[৫] অধিকারে ত্রিমাত্রা যোগ করিয়া তিনি আরবের জাহেলিয়াত সমাজ তথা গোটা বিশ্বের মানব সমাজের কাছে এক অনন্য নজির স্থাপন করিলেন।

তনয়াদের যত্নের ব্যাপারে পিতা-মাতা তথা অভিভাবকদের উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছেন, 'যেই ব্যক্তি দুইজন অথবা তিনজন দারিকা অথবা দুইজন বা তিনজন ভগিনীকে তাহাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করিবে, অথবা তাহাদের মারা যাওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করিবে, জান্নাতে আমি ও সেই ব্যক্তি দুইটি অঙ্গুলির মতো মিলিয়া মিশিয়া একসাথে থাকিব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁহার শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা বৃদ্ধা অঙ্গুলির দিকে ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিলেন'।[৬]

সংসারে যোষিতার গুরুত্বকেও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন অপরিসীম চাহিদার মানসে। দয়িতাদের ব্যাপারে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বাগ্রে দেন-মোহর আদায়ের তাগিদ দিয়াছেন এবং দয়িতদের উপর তাহা রবের পক্ষ হইতে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পত্নীদের যাবতীয় অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পতিদের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। মহান আল্লাহ বলিয়াছেন,﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ 'তাহারা (কলত্ররা) তোমাদের আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাহাদের আবরণ' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলিয়াছেন, ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ 'কান্তিমানদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রহিয়াছে, যেমনি রহিয়াছে তাহাদের উপর কান্তদের; কিন্তু কান্তিমানদের উপর কান্তদের মর্যাদা রহিয়াছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(আল-বাক্বারা, ২/২২৮)*। আল্লাহ আরও বলিয়াছেন, ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 'তোমরা তোমাদের সহধর্মিণীদের সহিত সদাচরণ করিবে' *(আন-নিসা, ৪/১৯)*।

ধর্মপত্নীর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তাহার স্ত্রীর নিকট উত্তম'।[৭] এমনকি হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনেও উপায়ান্তর না দেখিয়া খুলাফায়ে রাশেদীনের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও করণীয় ঠিক করিয়াছিলেন তাঁহারই অর্ধাঙ্গী উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া।

বনিতাদের এইসব অধিকার সেই যুগে তাহাদের মনোজগতে এক বিপ্লবের দ্বার উন্মোচিত করিয়াছিল। তাইতো বীতশোক উনপাঁজুরে শর্বরীরা মুশরিকদের কতশত অতলস্পর্শী কাঠখোট্টা অত্যাচার, অবর্ণনীয় যুলুম আর অনির্বচনীয় নির্যাতন সত্ত্বেও দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যেইখানে পুত্রিকাদের কোনো অধিকার ছিল না, সেইখানে বিধবার অধিকারের কথা চিন্তা করা তো ছিল আকাশে অট্টালিকা নির্মাণ করিবার মতো দুঃসাহস। আর তাহাদের প্রতি অবিচারের শাস্তির অনুবিধি তো ছিলো কল্পনাতীত। সেইখানে তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, 'যাহারা বিধবা আওরতের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিবে, তাহারা যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং নিরলস ছালাত ও সদা ছিয়াম পালনকারী'।[৮] আর যাহারা সতী-সিদ্ধ বামাদের অপবাদ দেয়, তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিলেন, ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 'আর যাহারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করিবে এবং চারজন সাক্ষী লইয়া না আসিবে, তাহা হইলে তাহাদের (অপবাদ আরোপকারীদের) আশিটি বেত্রাঘাত করিতে হইবে' *(আন-নূর, ২৪/৪)*। আর তাহাদের ফাসিক্ব বলিয়াও আখ্যায়িত করিলেন। গ্রীক সভ্যতায়, রোমান সভ্যতায়, ভারতীয় সভ্যতায় এবং চৈনিক সভ্যতায় ও বিভিন্ন ধর্মে লাঞ্ছনা আর যুলুমের শিকার হইয়াছিল যে নারী ও নারিত্ব, ইসলাম তথা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেইখান হইতে নারীদের মুক্তি দিয়া পৃথক ব্যক্তিসত্ত্বা স্বীকার করিয়া সমাসীন করিয়াছেন মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে। বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলিয়াছেন, 'মেদিনীর সবকিছুই সম্পত্তি, ইহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি হইলো সাধ্বী অঙ্গনা'।[৯]

---

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৭১।
৬. মুসনাদে আহমদ, হা/১৪৭।
৭. তিরমিযী, হা/৩৮৯৫।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬০০৭; ছহীহ মুসলিম হা/২৯৮২।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৭।

কবিতা

ভাবনা জাগে মনে

-মো. জোবাইদুল ইসলাম
আলিম ১ম বর্ষ, সুফিয়া নুরিয়া ফাজিল মাদ্রাসা,
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

উষার আলো ফুটলে তবে
ভাবনা জাগে মনে,
কে উঠালো সূর্যটাকে
দিনের শুরু ক্ষণে।
সূর্যি মামার প্রখর আলো
কে দিলো তার গায়ে,
আলো বিলায় পাহাড়-পর্বত
কিংবা পল্লি গাঁয়ে।
কোন সে মহান সত্তা তিনি
সৃষ্টি করলেন বিশ্ব,
ডাকলে সাড়া দেন যে তিনি
ধনী-গরীব-নিঃস্ব।
সৃষ্টি যত করলেন তিনি
মানবজাতির জন্য,
মহান প্রভুর সৃষ্টি দেখে
আজকে মোরা ধন্য।

চিরসত্য

-মো. ফরহাদ খান
মীরগঞ্জ, চান্দিনা, কুমিল্লা।

চিরসত্য মৃত্যুকে তুমি
করো না কেন স্মরণ,
যতই করো তুমি বাঁচার চেষ্টা
হবে একদিন তোমার মরণ।
মরণ থেকে বাঁচার মতন
পাবে না কোনো পথ,
জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পার
মেনে চললে কুরআনের মত।
কুরআনের বিধান না মানিলে
কপাল তোমার মন্দ,
যদিও তোমার আছে চোখ
তবুও তুমি অন্ধ।
কথাগুলো হয়তো তোমার কাছে
লাগতে পারে মন্দ,
তবুও মৃত্যু চিরসত্য
তাতে নেই কোনো সন্দেহ।

দাড়ি!

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
বানারাস, ভারত।

সারশূন্য আমি, বক্ষে নেই স্বাধীনতার শ্বাস
আহা! কোনোভাবে বেঁচে রব এই মোদের আশ।
শোনো! উঠিছে আঁধার সোনালির বুকে মহারবে
ক্ষণে-ক্ষণে বিপদ-নাকাড়া বাজিছে বজ্র রবে।
বিজাতীয় মন্ত্রের জয়ধ্বনি আজ দিকে দিকে
ঘনীভূত গোলামীর বিজয়-রব সরব চারিদিকে।
নির্ভীক হও, হাজার কণ্ঠে আওয়াজ উঠাও
নূতন উষার সূর্য উঠিবে, উঠাও!
কেন, কার ভয়ে সমর্পণ করিবে কার চরণ তলে?
দেশ, দ্বীন, সব তোমার, ভয় পাও কুকুরের কলরোলে?
চাহে জীবন যাবে, দ্বীন-অধিকার বুকে নিয়ে রব
দাড়ি রেখেই যেথা ছিলাম সেথা কাজ করে যাব।
অনশনে, ভুখ হরতালে মাসের পর মাস পড়ে রব
নিজ দেশে অধিকার না আদায়ে পরাধীন হব?
নতুন অপশনের খোঁজে অন্যের দ্বারে কেন যাব?
নয় মিছিল! যদি আনো ফৎওয়া এক সুরে, এক রবে।
হানাফী, আহলেহাদীছ ভেদাভেদ না রবে
'হারাম ঐ ব্রান্ড' দেখব তবে কোন পথে ফেরার হবে।
স্কুল, কলেজ দ্বীন মানার প্রতিবন্ধকতা যেথায় হবে
আলেম সমাজের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ কেন না হবে?
চাকরি ছাড়ার ফৎওয়া যদি আসে কোনো কণ্ঠে
দ্বীন অনুসরণে যে দিল বাধা তাঁর হুকুম কার কণ্ঠে?
শোনো হে জাতি! ভুলে যাও 'অতীত ভুলে যাওয়া'
ইংরেজ এসেছিল বণিকের বেশে, ছিল সামান্য চাওয়া।
ভাবছ তুমি দাড়িই বা কী এসব তো ছিটেফোঁটা
বলে রাখি! একদিন চাইবে তোমার এরা রক্ত ফোঁটা।
ভুলে যাবে জাতি ঈমান কারে কয়, সয়ে যাবে সব
নীরব রবে সেই দিন, দ্বীন ভুলে বেদ্বীন হবে সব।
শত হোঁচটে মলিন মৃত্যু হবে, তুমি কোথাও না রবে
মসজিদে যাবে দ্বীন, বাহ্যিকরূপে কিছু না রবে।
এখনো সময় আছে হও আগুয়ান প্রাণপণে
হয়ে যাবে যা কিছু হয়ে যাক 'মরিসকো' না হব ক্ষণে।
বোরখা, চাহে দাড়ি, চাহে কুরবানীর ছুরি বা আর কিছু
অধিকার হাছিলে সোচ্চার হও ভুলে সব কিছু।

বাংলাদেশ সংবাদ

করোনাকালে মানুষের জীবনমানের খতিয়ান

করোনাকালে শহর ও গ্রাম মিলিয়ে ৪৮ শতাংশ পরিবার থেকে অন্তত একজন কাজ হারিয়েছেন বা কাজ পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ৭৭ শতাংশ নারীপ্রধান পরিবার অর্থনৈতিক অনটনে পড়েছে। কাজ হারিয়ে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন শহরের ৭৩.৩ শতাংশ এবং গ্রামের ৯২.৫ শতাংশ মানুষ। শহরে অস্থায়ীভাবে বসবাসরত মানুষেরা গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তাদের বেশির ভাগ গ্রামে গিয়েও কাজ পায়নি। একটি জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৬ শতাংশ বলেছেন যে, মহামারির সময়ে তাদের পরিবারের আয় কমে গেছে। ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা আয়কারী ব্যক্তিদের মধ্যে ৬৮ শতাংশের আয় কমেছে। এর মানে হচ্ছে এই মানুষগুলো দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছেন। ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয়কারীদের ৭৩ শতাংশের আয়ও হ্রাস পেয়েছে। দেখা গেছে কৃষিনির্ভর পরিবারগুলোর অবস্থা কিছুটা ভালো থাকলেও যারা অকৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা বেশি খারাপ। নারীদের অনেকেই কাজ বা চাকরি হারিয়েছেন। পাশাপাশি বেড়েছে অস্বাভাবিক মাত্রায় ঘরের কাজের চাপ। আশ্চর্যজনকভাবে শহরে নারীর কাজ ১২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই মহামারির সময়ে। উত্তরদাতাদের ৮২ শতাংশ মনে করেন মহামারি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে। করোনাকালে ঘুম কমে যাওয়া, ওজন বেড়ে বা কমে যাওয়া, শরীর ও মাথা ব্যথাসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে।

১০০ বছরের চাহিদা মেটাবে বঙ্গোপসাগরে মজুদ গ্যাস

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় বঙ্গোপসাগরের তলদেশে ৩ হাজার ১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে মোনাজাইট, জিরকন, রুটাইল, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ফসফরাস, সালফেট ও রেয়ার আর্থ এলিমেন্টসহ মূল্যবান খনিজ পদার্থের ভান্ডার পাওয়া গেছে। সাগরের তলদেশে পাওয়া গেছে সম্ভাব্য ১০০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের মজুত, যা দিয়ে দেশের ১০০ বছরের চাহিদা মেটানো সম্ভব। বর্তমানে দেশে মাত্র ১৪ বছরের গ্যাস মজুত রয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য দেয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমুদ্রে মূলত দুই ধরনের সম্পদ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রাণিজ (লিভিং) ও অপ্রাণিজ (নন-লিভিং) সম্পদ। অপ্রাণিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে তেল, গ্যাস, চুনাপাথর প্রভৃতি। খনিজের মধ্যে আরো রয়েছে ১৭ ধরনের খনিজ বালু। এর মধ্যে ইলমেনাইট, জিরকন, রুটাইল, ম্যাগনেটাইট, গ্যানেট, মোনাজাইট, কায়ানাইট, লিকোক্সিন উল্লেখযোগ্য। এ আটটি খনিজ বালু বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলোর দামও বেশি। বঙ্গোপসাগরের অর্জিত সমুদ্রসীমা থেকে বছরে প্রায় ১০ লাখ টন এসব খনিজ বালু আহরণ করা সম্ভব। এছাড়াও সাগরের তলদেশে ক্লেসার ডেপোজিট, ফসফরাস ডেপোজিট, এভাপোরাইট, পলিমেটালিক সালফাইড, ম্যাঙ্গানিজ নডিউল, ম্যাগনেসিয়াম নডিউল নামক খনিজ পদার্থ আকরিক অবস্থায় পাওয়া যাবে। এদের নিষ্কাশন করে লেড, জিংক, কপার, কোবাল্ট, মলিবডেনামের মতো দুষ্প্রাপ্য ধাতুগুলো আহরণ করা সম্ভব হবে। এসব দুষ্কর ধাতু উড়োজাহাজ নির্মাণ, রাসায়নিক কাজে এবং বিভিন্ন কলকারখানার কাজে ব্যবহার করা যাবে। অন্যদিকে, বঙ্গোপসাগরের প্রাকৃতিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তিও পাওয়া সম্ভব। বঙ্গোপসাগরের সি-বেডে রয়েছে অসংখ্য উদ্ভিদকুল (ফ্লোরা)। এ উদ্ভিদকুলকে ব্যবহার করে ওষুধ শিল্পে অনেক জীবনবিনাশী রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ওষুধ আবিষ্কার করা যাবে। এছাড়াও অর্জিত সমুদ্রসীমায় গ্রিন এনার্জিও মিলবে। এর মধ্যে উইন্ড এনার্জি, ওয়েভ এনার্জি, টাইডাল এনার্জি, ওশান কারেন্ট উল্লেখযোগ্য। সাগরের বাতাসকে কাজে লাগিয়ে উইন্ড এনার্জি, তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে ওয়েভ এনার্জি, জোয়ার-ভাটাকে কাজে লাগিয়ে টাইডাল এনার্জি তৈরি করা যাবে। এসব এনার্জি দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগানো সম্ভব।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

আফগানিস্তান যুদ্ধের সমাপ্তি : চলে যাচ্ছে মার্কিন সেনারা

দীর্ঘ ২০ বছর পর আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ঘোষণা অনুযায়ী প্রায় ২৫০০ থেকে ৩৫০০ মার্কিন সৈন্য আফগানিস্তানে এখনো রয়েছে, তারা ১১ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরে যাবে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে কথিত হামলার জেরে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। দীর্ঘ এই যুদ্ধের ২০ বছর পূর্তির সময়ের মধ্যেই আফগানিস্তান থেকে সব মার্কিন সেনা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। গতবছর তালেবানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বাহিনীর সেনাদের ১ মে থেকে

আফগানিস্তান ছাড়ার কথা। আফগানিস্তানে আছে প্রায় আড়াই হাজার মার্কিন সেনা এবং প্রায় ৭ হাজার ন্যাটো ও মিত্রবাহিনীর সেনা। মার্কিন সেনাদের সঙ্গে সঙ্গে এই সেনাদেরও আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। আফগানিস্তানে দখলদার মার্কিন সামরিক বাহিনীর ২০ বছরের যুদ্ধে খরচ হয়েছে ২.২৪ ট্রিলিয়ন ডলার। এক গবেষণা রিপোর্টে অনুসারে, আফগান যুদ্ধের সারসরি ফল হিসেবে এ পর্যন্ত আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে মারা গেছে দুই লাখ ৪১ হাজার মানুষ। এর মধ্যে রয়েছে ২,৪৪২ জন মার্কিন সেনা, ছয়জন প্রতিরক্ষা দপ্তরের বেসামরিক লোক, ৩,৯৩৬ জন মার্কিন ঠিকাদার এবং মিত্র জোটের ১,১৪৪ জন সেনা। যুদ্ধে ৬৬ হাজার থেকে ৬৯ হাজার আফগান সেনা ও পুলিশ মারা গেছে, পাকিস্তানের সেনা মারা গেছে ৯,৩১৪ জন। গবেষণা রিপোর্ট বলা হয়েছে, ৭১ হাজারের বেশি বেসামরিক নাগরিক মারা গেছে যার মধ্যে ৪৭ হাজার আফগানিস্তানের ও ২৪ হাজার পাকিস্তানের। অন্যদিকে, আফগান তালেবান মারা গেছে ৫১ হাজার এবং পাকিস্তানের তালেবান ও তালেবানপন্থি গেরিলা মারা গেছে ৩৩ হাজার। এছাড়া, আফগান যুদ্ধে ১৩৬ জন সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মী এবং ৫৪৯ জন ত্রাণকর্মী নিহত হয়েছে।

ভারতে টার্গেট করা হচ্ছে একের পর এক মসজিদকে

ভারতে একটার পর একটা ঐতিহাসিক মসজিদ টার্গেট করা হচ্ছে। গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে পড়েছে ভারতের মসজিদগুলো। বাবরি-জ্ঞানবাপীর পর এবার টার্গেট আগ্রা জামে মসজিদ। সম্প্রতি কাশিতে অবস্থিত জ্ঞানবাপী মসজিদ কোনো মন্দির ভেঙে গড়া হয়েছে কি-না, তা খতিয়ে দেখতে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ চালাতে নির্দেশ দেয় বারানসির একটি আদালত। এটার রেশ কাটতে না কাটতেই এক সপ্তাহের মধ্যে একই ধরনের জরিপ চালাতে উত্তরপ্রদেশের মথুরার একটি আদালতে পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। রাজ্যটির আগ্রায় অবস্থিত জাহানারা মসজিদের (আগ্রা জামে মসজিদ নামে বেশি পরিচিত) নিচে হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের মূর্তি আছে কি-না, তা খতিয়ে দেখতে এই পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। পিটিশনে বলা হয়েছে, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব মথুরা জামানস্থান মন্দিরে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সেখান থেকে কৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে আসেন। পরে আগ্রায় জাহানারা মসজিদের নিচে সেটিকে পুঁতে রাখেন। মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির লাগোয়া শাহী ঈদগাহ সরানোর দাবি জানানো আইনজীবী শৈলেন্দর সিং এই পিটিশন দায়ের করেছেন। পিটিশনে বলা হয়েছে, জাহানারা মসজিদের নিচে দেব-দেবী মূর্তি আছে কি-না তা খতিয়ে দেখা জরুরি। এ সময় জ্ঞানবাপী মসজিদে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ চালানোর বিষয়ে বারানসির আদালতের রেফারেন্স দিয়ে জাহানারা মসজিদের ক্ষেত্রেও এমনটা করতে বলা হয়েছে।

মুসলিম বিশ্ব

গ্রিনল্যান্ডের মুসলিমরা এবার ২০ ঘণ্টা ছিয়াম রাখবেন!

সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রায় ২০ ঘণ্টা ছিয়াম রাখবেন গ্রিনল্যান্ডে বসবাসরত মুসলিমরা। তাদের ছিয়াম রাখতে হবে ১৯ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট। তারপর আইসল্যান্ডে ১৯ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট, ফিনল্যান্ডে ১৯ ঘণ্টা ৯ মিনিট, সুইডেনে ১৮ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট এবং স্কটল্যান্ডের মুসলিমরা ১৮ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট ছিয়াম পালন করবেন। এদিকে সবচেয়ে কম সময় ধরে ছিয়াম পালন করবেন নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীরা। তারা ছিয়াম পালন করবেন ১১ ঘণ্টা ২০ মিনিট। তারপর চিলি ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট, অস্ট্রেলিয়া ১১ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট, উরুগুয়ে ১১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলিমরা ১১ ঘণ্টা ৫২ মিনিট ছিয়াম পালন করবেন। এদিকে বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের মুসলিমরা ১৪৪২ হিজরির রামাযানের প্রথমদিন ছিয়াম পালন করবে প্রায় ১৪ ঘণ্টা ৮ মিনিট।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বিপজ্জনক ২শ' অকেজো যন্ত্রাংশ মহাকাশে ঘুরছে

মহাকাশে পৃথিবীর কক্ষপথে ২৬ হাজারের বেশি যন্ত্রের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন হাজারের মতো সক্রিয় স্যাটেলাইট ছাড়া বাকি সবই বিকল বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ২০০টির মতো এমন ভারী ধাতব বস্তু রয়েছে যেগুলোকে 'টাইম বোমা'র সঙ্গে তুলনা করা যায়। এগুলো যেকোনো সময় সক্রিয় স্যাটেলাইটে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। মহাকাশে ভেসে বেড়ানো এসব যন্ত্র পর্যবেক্ষণে 'অস্ট্রিয়াগ্রাফ' নামে একটি অনলাইন ম্যাপ মহাকাশে থাকা বস্তুগুলোর প্রায় চলমান সময়ের অবস্থানই জানান দিতে সক্ষম। বিশেষ করে রকেট বডির সুপার-স্প্রেডার মহাকাশে রয়ে যায় এমন ২০০টির ওপর নজর রাখছে অস্ট্রিয়াগ্রাফ। এগুলো ভেঙে চুরে গেলে হাজার হাজার টুকরো হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে পারে। এতে সক্রিয় স্যাটেলাইট আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। বিঘ্ন ঘটতে পারে আবহাওয়া বার্তা ও জিপিএস সেবার মতো অনেক কাজে।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা→ তাওহীদ

প্রশ্ন (১) : মহান আল্লাহ কি কখনো মুহূর্তের জন্যও পৃথিবীতে এসেছেন?

-আব্দুর রহমান
দিনাজপুর।

উত্তর : মহান আল্লাহ আরশে সমুন্নত (সূরা ত্বহা, ৪)। তবে তিনি পৃথিবীতে নয়। বরং প্রতি রাতেই দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব (ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৫; ছাহীহ মুসলিম, হা/৭৫৮)। তবে তাঁর এই আসমানে অবতরণের ধরন ও প্রকৃতি মানুষের জ্ঞানের বহির্ভুত বিষয়। বরং তার পবিত্র স্বকীয় সত্তার জন্য যেভাবে শোভন সেই ভাবেই সেটা হয়ে থাকে।

ঈমান-আক্বীদা→ নবী-রাসূল

প্রশ্ন (২) : ঈসা আলাইহিস সালাম-এর কোনো সন্তান ছিল কি? পুনরায় যখন তিনি পৃথিবীতে আসবেন তখন কি তিনি বিবাহ-শাদী করবেন?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : কুরআন-হাদীছে ঈসা আলাইহিস সালাম -এর বিবাহ করা না করা ও তার সন্তানাদী সম্পর্কে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। আর এটা জানার মধ্যে আমলের ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমাণ কোনো লাভও নেই। বিধায় এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা বা অনুসন্ধান করা একেবারেই নিঃস্প্রয়োজন।

ঈমান-আক্বীদা→মতবাদ

প্রশ্ন: (৩) কোন বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হলে করণীয় কী?

উত্তর : এমতাবস্থায় বিষয়টিকে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অতঃপর দলীলের আলোকে যেটি অগ্রগণ্য হবে, সেটাকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক' (আন-নিসা, ৫৯)। উল্লেখ্য, যদি নির্ভরযোগ্য আলেমদের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে অপেক্ষাকৃত বেশী বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও জ্ঞানী আলেমের বক্তব্য গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি ঠিক ঐ রোগীর মত, যে তার চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও জ্ঞানী ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। দুনিয়াবী বিষয়ে যদি এত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তাহলে দ্বীনী বিষয়ে আরো কত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত! (মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ২৬/৪৮১-৪৮৫ পৃ.; মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনু বায, ২৪/৭১-৭২ পৃ.)। তবে এ ধরণের ইখতিলাফী মাসআলার সংখ্যা খুবই কম।

প্রশ্ন (৪) : জিন জাতিকে আগে সৃষ্টি করা হয়েছে? নাকি ফেরেশতাদেরকে? দলীল সহকারে বিস্তারিত জানাবেন।

-আব্দুল কুদ্দুস
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : জিন জাতির পূর্বে ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কেননা তারা জিন জাতির আমল নামা অবলকন করে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা যখন মানব জাতিকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন, তখন জিন জাতির অপকর্ম এবং পৃথিবীতে তাদের বিপর্যয় সৃষ্টির অভিজ্ঞতা থেকে তারা মানব সৃষ্টি না করার মতামত ব্যক্ত করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে পরবর্তী জাতি তথা খলিফা সৃষ্টি করতে চাই। ফেরেশতারা বলল, আপনি কি এমন জাতি সৃষ্টি করবেন? যারা সেখানে বিসৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে (আল-বাক্বারা, ৩৯)। যেহেতু ফেরেশতাদের একটি দলের কাজ হচ্ছে, জিন ও মানব জাতির আমল নামা লিখা। সুতরাং জিন ও মানব জাতির পূর্বে ফেরেশতাদের সৃষ্টি।

কুরআন→ তেলাওয়াত

প্রশ্ন (৫) : ছালাতের পর মসজিদে কুরআন তেলাওয়াত শুরু হয়। এমতাবস্থায় যদি সেখান থেকে চলে আসা হয় তাহলে কি পাপ হবে?

-রাশিদুল ইসলাম আওলাদ
হাতিবান্ধা, লালমণিরহাট।

উত্তর : না, পাপ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, অতঃপর যখন ছালাত শেষ হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক্ব) তালাশ করো'...(জুম'আহ, ৬২/১০)।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ছালাত শেষে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়ে রিযিক্ব অন্বেষণের আদেশ করেছেন। তাই কর্মব্যস্ত মানুষ হলে সেখান থেকে চলে যাওয়াতে কোনো দোষ নেই। তবে বিশেষ কোনো প্রয়োজন না থাকলে সেখানে বসে কুরআনের তেলাওয়াত শুনা, কুরআন শেখা, শিখানো অথবা তেলাওয়াত করা ভালো। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শুনো এবং চুপ থাকো' (সূরা ইনশিক্বাক্ব ২১)। উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭; আবূ দাঊদ, হা/১৪৫২, মিশকাত, হা/২১০৯)।

হাদীছ→উছূলুল হাদীছ

প্রশ্ন (৬) : মাশহূর, গারীব ও আযীয হাদীছ কি গ্রহণযোগ্য বা মানা যাবে?

-আব্দুল হাসিব
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : এ পরিভাষাগুলো সনদে রাবীর সংখ্যা কম-বেশীর ভিত্তিতে সজ্ঞায়িত হয়ে থাকে। হাদীছ মাক্ববুল (গ্রহণযোগ্য) বা মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত) হওয়ার সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। বরং এ তিনটি পরিভাষা মাক্ববুল বা মারদুদ উভয়টি হতে পারে। যদি মাক্ববুলের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মারদুদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে (বিস্তারিত জানার জন্য তাইসীরুল মুছত্বলাহিল হাদীছ, মুছতালাহুল হাদীছ বা অন্য কোন উছূলে হাদীছের কিতাব পড়ুন)।

পবিত্রতা→ মাসিক-নিফাস-রক্তপ্রদর

প্রশ্ন (৭) : জনৈক মহিলার বর্তমানে হায়েযের মেয়াদ চলছে প্রায় ১৭/১৮ দিন পর্যন্ত। তার জন্য ছালাতের বিধান কী?

-আব্দুল হামীদ
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : পূর্ব হতে হায়েযের যে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে তা অতিক্রম হওয়ার পরও যদি কোন মহিলার রক্তস্রাব দেখা যায় তাহলে তা ইস্তেহাযা হিসাবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ওযূ করে ছালাত আদায় করবে। উরওয়া ইবনু যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা সর্বদা ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হতেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, যখন হায়েযের রক্ত হয় তখন তা কালো রক্ত হয়, যা সহজে চেনা যায়। এমতাবস্থায় ছালাত হতে বিরত থাকবে। যখন ভিন্ন রক্ত হবে, তখন ওযূ করবে এবং ছালাত আদায় করবে। কেননা এটা শিরার রক্ত (আবুদাঊদ, হা/২৮৬; নাসাঈ, হা/২১৫; মিশকাত, হা/৫৫৮; ফিকহুস সুন্নাহ, ১/৬৮ পৃ.)। উম্মু আতিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মেটে ও হলুদ রং হায়েযের মধ্যে গণ্য করতাম না (ছহীহ বুখারী, 'হায়েয' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ 'হায়েযের দিনগুলো ছাড়া হলুদ এবং মেটে রং দেখা')।

প্রশ্ন (৮) : নিফাস চলাকালীন স্ত্রী মিলন ঘটলে তার হুকুম কী?

-ফেরদাউস আলম

উত্তর : হায়েয ও নেফাস চলাকালীন সময়ে স্ত্রী সহবাস করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনার কাছে লোকেরা ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক' (সূরা আল-বাক্বারাহ ২২২)। এক্ষণে কেউ যদি এই নিষিদ্ধ সময় তথা হায়েয এবং নেফাস চলাকালীন সময় সহবাস করে ফেলে তাহলে তাকে তওবা করতে হবে এবং এক অথবা অর্ধ দ্বীনার সমপরিমাণ স্বর্ণ বা স্বর্ণের বর্তমান বাজার মূল্য ছাদাক্বা করতে হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায় সঙ্গম করল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে বলেন, সে এক দ্বীনার বা অর্ধ দ্বীনার ছাদাক্বা করবে (আবূ দাঊদ, হা/২৬৪; নাসাঈ, হা/২৮৯; ইবনু মাজাহ, হা/৬৪০)। উল্লেখ্য যে, এক দ্বীনার স্বর্ণ মুদ্রা সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। আর এক গ্রাম স্বর্ণের বর্তমান বাজার মূল্য যা হবে তার সাথে উক্ত সংখ্যা গুণ করলে এক দ্বীনার স্বর্ণের মূল্য বের হবে।

প্রশ্ন (৯) : আমাদের সমাজে মহিলারা তাদের হায়েয চলাকালীন অন্য কোনো মৃত মহিলাকে দেখতে ও গোসল দিতে পারে না। এ রকম রীতি কি ঠিক?

-রুমা আকতার

উত্তর : এধরণের রীতিনীতি ঠিক নয়। এগুলো সামাজিক কুসংস্কারমাত্র। কেননা ঋতুবতী অবস্থায় ছালাত, ছিয়াম, সহবাস ও স্পর্শ করে কুরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্য কোন কাজ নিষিদ্ধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনার কাছে লোকেরা ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক' (সূরা আল-বাক্বারাহ ২২২)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ঋতু অবস্থায় আমাদেরকে ছিয়াম ক্বাযা করার এবং ছালাত ছেড়ে দেয়ার আদেশ দেওয়া হত (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫; মিশকাত, হা/২০৩২)।

ইবাদত→ ছালাত

প্রশ্ন (১০) : হিন্দুদের বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : স্থান পবিত্র হলে এবং সামনে কোন ছবি, মূর্তি না থাকলে অমুসলিমদের বাড়ীতে ছালাত আদায় করা যায়। কেননা ছালাতের নিষিদ্ধ স্থানগুলো হল, (১) কবরস্থান (২) গোসলখানা (৩) উট বাঁধার স্থান ও (৪) অপবিত্র স্থান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যমীন সর্বত্রই মসজিদ, কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত (আবুদাঊদ, হা/৪৯২; তিরমিযী, হা/৩১৭; মিশকাত, হা/৭৩৭)। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন (তিরমিযী, হা/৩৪৮; মিশকাত, হা/৭৩৯)। উল্লেখ্য যে, মন্দিরের চত্বরেও ছালাত আদায় করা যায়, যদি সেখানে কোন ছবি ও মূর্তি না থাকে। ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় ছালাত আদায় করি না এজন্য যে, সেখানে মূর্তি থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু এমন গীর্জায় ছালাত আদায় করেছেন, যেখানে কোন ছবি বা মূর্তি ছিল না'(ছহীহ বুখারী, ১/৬২ পৃঃ 'গীর্জায় ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, গীর্জা বা মন্দিরকে মসজিদ বানিয়ে নিতে হবে। কেননা স্থায়ীভাবে কোন স্থানকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করতে গেলে ঐ স্থানটিকে মসজিদের নামে ওয়াকফ্ করতে হবে (নাসাঈ, হা/৩৩৭২-৭৩)।

প্রশ্ন (১১) : ছবিযুক্ত টাকা পকেটে নিয়ে ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত কবুল হবে কি?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : ছবিযুক্ত টাকা পকেটে থাকলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা সেটা চোখে দেখা যায় না। একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বললেন, তুমি এ ছবি সম্বলিত চাদরটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে নাও। এর ছবি আমার ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট করে (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৪; মিশকাত, হা/৭৫৮)। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছবি সম্বলিত কাপড়টি সরিয়ে রাখতে বলেছেন। কিন্তু ঐ ছালাত দ্বিতীয়বার আদায় করেননি। সুতরাং, ছালাতের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে কাপড়ে ছবি থাকলে অথবা খোলা স্থানে টাকা বা ছবি থাকলে ছালাত আদায় করা উচিত নয়। কেননা যেখানে ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬; মিশকাত, হা/৪৪৮৯)।

প্রশ্ন (১২) : একাকী ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করলে নিম্নস্বরে ক্বিরাআত করা যাবে কি?

-হারুর
নীলফামারী।

উত্তর : নীরবে পড়া যাবে না; বরং একাকী হলেও স্বরবে পড়তে হবে। রাতের জেহরী ছালাতগুলো রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবুবকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু ও ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু একাকী স্বরবে পড়তেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের ছালাতে কোন কোন সময় একটু উচ্চস্বরে ক্বিরআত করতেন আবার কোন কোন সময় নিম্নস্বরে (আবুদাঊদ, হা/১৩২৮, সনদ হাসান; মিশকাত, হা/১২০২)। তিনি ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে নিম্নস্বরে ও আবুবকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে উচ্চস্বরে ক্বিরআত পড়ার নির্দেশ দেন (আবুদাঊদ, হা/১৩২৯; মিশকাত, হা/১২০৪)। তবে মাসবুক ব্যক্তি নিম্নস্বরে ক্বিরাআত পড়বে। যাতে অন্য মুছল্লীর সমস্যা না হয় (ফাতওয়া নাজনা দায়েমা ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ৪১১-৪১৫)।

প্রশ্ন (১৩) : তাহাজ্জুদের জন্য উত্তম সময় কখন? ফজরের আযানের পূর্বক্ষণে তাহাজ্জুদ ও বিতর আদায় করা যাবে কি?

-জেসমিন
রামপুরা, জয়পুরহাট।

উত্তর : তাহাজ্জুদ ছালাত রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে পড়া উত্তম। সুবহে ছাদেক হওয়ার আগ পর্যন্ত বা আযানের আগ পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ও বিতর পড়তে পারবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আমার খালা মায়মুনা-এর কাছে রাত কাটিয়েছিলাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার পরিবার বর্গের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করে শুয়ে পড়লেন। তারপর রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে তিনি উঠলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে পাঠ করলেন

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ .

এরপর দাঁড়ালেন এবং মিসওয়াক করে ওযূ করলেন। এরপর তিনি এগারো রাক'আত ছালাত আদায় করলেন। এরপর বেলাল আযান দিলেন তিনি দু'রাকআত ছালাত আদায় করলেন। তারপর বের হলেন এবং ফজরের ছালাত আদায় করলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪৫৬৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬৩)।

প্রশ্ন (১৪) : বিতর ছালাত পড়তে ভুলে গেলে করণীয় কী?

-জেসমিন
রামপুরা, জয়পুরহাট।

উত্তর : যদি কেউ বিতর পড়তে ভুলে যায় অথবা বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে স্মরণ হলে কিংবা রাতে বা সকালে ঘুম হতে জেগে উঠার পরে সুযোগ মত তা আদায় করবে।

আবূ সা'ঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি বিতরের ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ল অথবা আদায় করতে ভুলে গেল সে যেন যখনই স্মরণ হয় বা ঘুম হতে সজাগ হয়ে আদায় করে নেয় (আবূ দাঊদ, হা/১৪৩১; তিরমিযী, হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ, হা/১১৮৮; মিশকাত, হা/১২৭৯)। অন্যান্য সুন্নাত-নফলের ন্যায় বিতরের ক্বাযাও আদায় করা যায় (ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/১৪৮ পৃ.; নায়লুল আওত্বার ৩/৩১৮-১৯ পৃ.)।

প্রশ্ন (১৫) : যারা অনেক দিন থেকে অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী হয়ে ছালাত আদায় করতে পারে না তারা যদি ঐ অবস্থায় মারা যায় তাহলে কি ঐ ছালাতের ফারযিয়াত আদায়ের জন্য তাদের পক্ষ থেকে কোনো দান-ছাদাক্বা করা যাবে?

-কামরুজ্জামান
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : অসুস্থ ব্যক্তির দুইটি অবস্থা হতে পারে- ১. অসুস্থ ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। ২. অসুস্থ ব্যক্তির জ্ঞান থাকা। মানুষ যতই অসুস্থ্য হোক না কেন যদি তার জ্ঞান থাকে তাহলে ছালাতের সময় হলে অবশ্যই তাকে ছালাত আদায় করতে হবে। নিজে ওযূ করতে অক্ষম হলে অন্যের সাহায্যে ওযূ করে ছালাত আদায় করবে। পানি স্পর্শে সমস্যা হলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে। দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ে অক্ষম হলে যেভাবে সুবিধা সেভাবে ছালাত আদায় করবে। ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে ছালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে, তাতে সমর্থ না হলে বসে; যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে' (ছহীহ বুখারী, হা/১১১৭)। বিশিষ্ট তাবেঈ আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কিবলার দিকে মুখ করতে অক্ষম ব্যক্তি যে দিকে সম্ভব সে দিক মুখ করে সালাত আদায় করবে (ছহীহ বুখারী, অধ্যায়-১৯)। সুতরাং অসুস্থ্য ব্যক্তিকে ছালাত আদায় করাতে সকল প্রকার সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য। আর যদি অজ্ঞান হয় তাহলে তার জন্য ছালাতের বিধান প্রযোজ্য নয় (তিরমিযী, হা/১৪২৩; আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩; মিশকাত, হা/৩২৮৭)। উল্লেখ্য যে, কেউ ছালাত আদায় না করে মারা গেলে তার পক্ষ থেকে কাফফারার কোনো বিধান নেই।

প্রশ্ন (১৬) : আমাদের (মেয়েরা) হোস্টেলে ৪ জনকে এক রুমে থাকতে হয়। ৩ জন মুসলিম ও ১ জন হিন্দু। হিন্দু মেয়েটি রুমে ছোট একটা মূর্তি রাখে ও সন্ধ্যায় মাগরিবের সময় ধুপকাঠি জ্বালিয়ে পূজা করে। আমরা সেই রুমেই ছালাত আদায় করি। কেননা হোস্টেলে মেয়েদের ছালাতের জন্য আলাদা কোনো রুম নেই। আমাদের ছালাত কি হচ্ছে? নাকি বাতিল হচ্ছে? এক্ষেত্রে করণীয় কী?

সুমাইয়া ইয়াসমিন
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামে ছবি-মূর্তি একটি নিষিদ্ধ হারাম বিষয়। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর সর্বপ্রথম মক্কার ভিতর যে ৩১৩টি মূর্তি ছিল তা ভেঙ্গে চৌচির করেন এবং মুসলিমদের ইবাদতের জন্য মক্কাকে মূর্তি মুক্ত করেন। যে ঘরে মূর্তি বা ছবি থাকে সে ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এই মর্মে আবূ তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ঘরে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৪৯; মিশকাত, হা/৪৪৮৯)। অত্র হাদীছ এবং ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য যে, সে যে ঘরে বসবাস করবে সে ঘরকে ছবি এবং মূর্তি মুক্ত করা। জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের দরজায় ঝুলানো কারুকার্য খচিত পর্দায় ছবি এবং বাসায় কুকুর থাকার কারণে প্রবেশ না করে ঘুরে চলে যায় (তিরমিযী, হা/২৯৭০; আবূ দাঊদ, হা/৪১৫৮; মিশকাত, হা/৪৫০১)। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমরা তোমাদের গির্জাসমূহে প্রবেশ করি না, কারণ তাতে মূর্তি রয়েছে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা গির্জায় ছালাত আদায় করতেন। তবে যেগুলোতে মূর্তি রয়েছে সেগুলোতে নয় (ছহীহ বুখারী, হা/৫৪)। উল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণ হয় যে, যে ঘরে প্রকাশ্য ছবি মূর্তি থাকবে সে ঘরে ছালাত হবে না। অতএব ইবাদতের জন্য ঘরকে ছবি মূর্তি মুক্ত করতে হবে। অন্যথায় রুম পরিবর্তন করতে হবে বা কর্তৃপক্ষকে অবগত করত রুমমেন্টকে অন্যত্র শিপ্ট করতে হবে। কেননা মূর্তি বিশিষ্ট ঘরে একজন মুসলিমের বসবাস করাই বৈধ নয়।

প্রশ্ন (১৭) : রুকূ ও সিজদার তাসবীহ কি বিজোড় সংখ্যক পড়তে হবে?

-ড. গোলাম মোর্তুজা
পদ্মা আবাসিক, রাজশাহী।

উত্তর : রুকূ ও সিজদায় যতবার ইচ্ছা তাসবীহ পড়া যাবে জোড়-বেজোড়ের কোনো হিসাব নেই। তবে তিনবার পড়া সুন্নাত এবং একবার পড়া জরুরী। হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি এক রাতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে ছালাত আদায় করতে দেখেন। এ সময় তিনি *আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার* বলে *যুল মালাকূতি ওয়াল জাবারূতি ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল আযমাতি*

পাঠ করেন। অতপর তিনি সূরা বাক্বারা পড়া শুরু করেন। তারপর তিনি রুকু করেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন যতক্ষণ প্রায় রুকু করলেন ততক্ষণ। তিনি রুকুতে ‘সুবহানা রব্বিয়াল আযীম, সুবহানা রব্বিয়াল আযীম’ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি রুকু থেকে উঠে দাড়িয়ে থাকলেন প্রায় ততক্ষণ রুকুতে ছিলেন যতক্ষণ। এ সময় তিনি ‘লি রব্বিয়াল হামদ’ পাঠ করেন। এরপর তিনি সিজদায় যান। সিজদায় তিনি প্রায় ততক্ষণ ছিলেন দাঁড়িয়ে ছিলেন যতক্ষণ। তিনি সিজদায় ‘সুবাহানা রব্বিয়াল আলা’ পাঠ করেন’... (আবূ দাঊদ, হা/৮৭৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭২; নাসাঈ)। হুযাযফা ইবনু ইয়ামান রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে রুকুতে তিনবার ‘সুবাহানা রব্বিয়াল আযীম’ এবং সিজদায় ‘সুবহানা রব্বিয়াল আলা’ পড়তে শুনেছেন (ইবনু মাজাহ, হা/৮৮৮)।

প্রশ্ন (১৮) : সুন্নাত ছালাত আদায় না করলে কি পাপ হবে?

-মুমিন
দিনাজপুর।

উত্তর : সুন্নাত ছালাতগুলোর গুরুত্ব ও ফযিলত অনেক বেশী। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ‘যে মুসলিম বান্দা আল্লাহর জন্য দিনে ১২ রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করবে (ফরয নয়) তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মান করবেন’। উম্মে হাবীবা ম বলেন, এই হাদীছ শোনার পর থেকে সর্বদা আমি এই ছালাত পড়তাম (ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৮)। ইবনু মাজাহ’র বর্ণনায় আছে, তা হল, যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত ও পরে দুই রাক‘আত, মাগরিবের পরে দুই রাক‘আত, এশার পরে দুই রাক‘আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক‘আত (ইবনু মাজাহ, হা/১১৪০, ছহীহ)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, ক্বিয়ামতের দিন বান্দার ফরজ ছালাতে ঘাটতি থাকলে তা এই সুন্নাত দ্বারা পূরণ করা হবে (আবূ দাঊদ, হা/৮৬৪; তিরমিযী, হা/৪১৩; মিশকাত, হা/১৩৩০)। সুতরাং সুন্নাত ছালাতগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া যরুরী। তবে কোনো কারণে তা আদায় করতে না পারলে গুনাহ হবে না।

প্রশ্ন (১৯) : ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে করণীয় কী?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে হাঁচি দাতা ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলতে পারবে। তবে উচ্চৈঃস্বরে নয়। বরং নিম্নস্বরে বলবে। রিফাআ ইবনু রাফি রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে ছালাত আদায় করছিলাম। তখন আমার হাঁচি এলো আমি বললাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ. রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাত শেষ করে বললেন, ছালাতে কে কথা বলছিল? কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। তৃতীয়বার প্রশ্ন করলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমি কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, কী বলছিলে? আমি বললাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই যাতের কসম, যাঁর আমার প্রাণ আছে! ত্রিশেরও অধিক ফেরেশতা এসেছিল, কে আগে এর ছওয়াব উঠিয়ে নিতে পারে (ছহীহ মুসলিম, হা/৬০০)। তবে তার জওয়াব দেয়ার কোন দলীল নেই।

ইবাদত→ছিয়াম

প্রশ্ন (২০) : আমার উম্মাত ততদিন সুন্নাতের উপর থাকবে যতদিন তারা ইফতার করার জন্য তারকা দেখার অপেক্ষা করবে না- ইবনু হিব্বানে বর্ণিত এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-আব্দুর রহমান
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : হ্যাঁ, প্রশ্নোল্লিখিত হাদীছটি ছহীহ। সাহল ইবনু সা‘দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার উম্মত ততদিন সুন্নাতের উপর থাকবে, যতদিন তারা ইফতার করার জন্য তারকা দেখার অপেক্ষা না করবে’। বর্ণনাকারী আরো বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ছিয়াম রাখতেন, তখন কাউকে উপরে উঠার আদেশ দিতেন। যখন সে বলত সূর্য ডুবে গেছে, তখন তিনি ইফতার করে নিতেন’ (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩৫১০; ছহীহুল জামে‘, হা/৪৭৭২)।

ইবাদত→হজ্জ-উমরা

প্রশ্ন (২১) : একজন ব্যক্তি জীবনে কতবার উমরা করতে পারে। তার কি নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ আছে?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : একজন ব্যক্তি জীবনে একাধিকবার উমরা করতে পারে যা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী থেকে বুঝা যায়। কিন্তু তার সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘এক উমরা থেকে পরবর্তী উমরা মধ্যবর্তী সময়ের (ছগীরা গুণাহের) কাফফারাস্বরূপ। আর হজ্জে মবরূরের (ত্রুটিমুক্ত) একমাত্র প্রতিদান জান্নাত (নাসাঈ, হা/২৬২২; ইবনু মাজাহ, হা/২৮৮৮)।

উল্লেখ্য যে, এক সফরে দুই উমরাহ করা যাবে না। যেমন হজ্জ বা উমরা করতে গিয়ে এক ব্যক্তি একাধিক ওমরা করতে পারবে না। এ বিষয়ে সঊদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের পর অধিক সংখ্যক উমরাহ করার আগ্রহে 'তানঈম' বা জি'ইর্রানাহ নামক স্থানে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসেন। শরী'আতে এর কোনই প্রমাণ নেই' (দলীলুল হাজ্জ ওয়াল মু'তামির, অনু : আব্দুল মতীন সালাফী, 'সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলী' অনুচ্ছেদ, মাসআলা-২৪, পৃঃ ৬৫)। সঊদী আরবের সাবেক ২য় মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এটি জায়েয নয়। বরং বিদ'আত। কেননা এর পক্ষে একমাত্র দলীল হ'ল বিদায় হজ্জের সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ওমরা। অথচ ঋতু এসে যাওয়ায় প্রথমে হজ্জে ক্বিরান-এর ওমরা করতে ব্যর্থ হওয়ায় হজ্জের পরে তিনি এটা করেছিলেন। তার সাথে 'তানঈম' গিয়েছিলেন তার ভাই আব্দুর রহমান। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় ওমরাহ করেননি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথী অন্য কোন ছাহাবীও এটা করেননি' (ঐ, মাজমূ' ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৫৯৩; ঐ, লিক্বা-উল বাব আল-মাফতূহ, অনুচ্ছেদ ১২১, মাসআলা ২৮)। শায়খ আলবানীও একে নাজায়েয বলেছেন এবং একে 'ঋতুবতীর ওমরা' (عمرة الحائض) বলেছেন (সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমও একে নাজায়েয বলেছেন (যাদুল মা'আদ, ২/৮৯ পৃ.)।

প্রশ্ন (২২) : মাহরামের সামনে পর্দার ক্ষেত্রে মহিলার জন্য কী কী ছাড় রয়েছে? মাহরামের সাথে মহিলারা কি হজ্জে যেতে পারবে এবং সে কতটুকু পর্দা করবে?

আফছানা বিনতে আজাদ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মাহরাম পুরুষের সামনে একজন নারী পূর্ণ পর্দা না করে বরং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে' (আন-নূর, ৩১)। এখানে 'সৌন্দর্য' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুরমা, মিসওয়াক ও মেহেদী (তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর)। তাফসীরে ইবনু কাছীরে বলা হয়েছে- 'সৌন্দর্য' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কানের দুল, বাজুবন্ধ বা চুড়ি, নুপুর ও গলার হার। (তাফসীরে ইবনু কাছীর)। তাই মাহরামের সামনে নারী মাথা, চুল, মুখ, হাত ও পা প্রকাশ করে রাখতে পারে।

মাহরাম সাথে না থাকলে কোনো মহিলার জন্য হজ্জে যাওয়া নিষিদ্ধ (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৮৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৮)। হজ্জে গিয়ে ইহরাম অবস্থায় নারীদের জন্য মুখ ঢেকে রাখা ও হাতমোজা পরা যাবে না (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৩৮; মিশকাত, ২৬৭৮)। তবে পরপুরুষের সামনে পড়লে মাথার কাপড়টি মুখের উপর টেনে দেওয়া যাবে (ইরওয়াউল গালীল, হা/১০২৩; মিশকাত, হা/২৬৯০)।

ইবাদত→যাকাত-ছাদাক্বা

প্রশ্ন (২৩) : কিছুদিন পরে আমরা একটি মাদরাসা করতে চাই। তাই মাদরাসা করার নিয়তে যাকাতের টাকা রেখে দেয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উত্তর : কোন হক্বদারকে মাহরুম না করে মাদরাসায় যাকাতের অর্থ প্রদান করা বা উক্ত অর্থ দিয়ে মাদরাসার নামে জমি ক্রয় করা এবং ছাত্রদের জন্য আবাসিক বা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা যাবে। তবে শর্ত হল অবশ্যই মাদরাসাটি ব্যক্তি মালিকানা ও শিরক-বিদ'আতমুক্ত হতে হবে এবং তা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত হতে হবে। যেখানে কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, উছূল, ফিক্বহ, ফারায়েয, বালাগাত, আবরী সাহিত্য ও ব্যাকরণসহ প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করাতে হবে। মূলত এ ধরনের মাদরাসাগুলোতেই প্রকৃত ইলম ও দ্বীন চর্চা হয় এবং ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখে থাকে। এ ধরনের মাদরাসাগুলোকে যাকাতের ৮টি খাতের মধ্যে 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয় (সূরা আত-তওবাহ : ৬০)।

এমনি এক প্রশ্নোত্তরের শেষাংশে একবিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক এবং একাডেমিক ভবন নির্মাণে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয। বই ক্রয় এবং ভবন তৈরি উভয় বিষয়ের মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কিতাব থেকে একটু বেশী উপকৃত হয়। কিতাব ছাড়া ইলম অনেকটাই অসম্ভব, যা ভবনের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাছাড়া সেখানে যখন গরীব-ইয়াতীম ছাত্ররা থাকবে, তখন সেই গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের দারিদ্র্যতার জন্য ভবন নির্মাণে ব্যয় করা যাবে (ফকীর বা দরিদ্র ব্যক্তি ৮টি খাতের একটি)। অনুরূপ অন্যান্য মাদরাসাও নির্মাণ করা যাবে যখন মসজিদে দারস দেয়া সম্ভব হবে না। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত (মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ২৫২-২৫৩)।

ইবাদত→ যিকির ও দু'আ

প্রশ্ন (২৪) : এক মসজিদের আযানের জবাব দেয়ার পর যদি আরেক মসজিদের আযান শুনতে পাই তারও কি জবাব দিতে হবে?

-হারুন
নীলফামারী।

উত্তর : এক আযানের জওয়াব দেয়ার পর আরেক আযানের জওয়াব দেয়া বাধ্যতামূলক নয়। তবে সম্ভব হলে একাধিক

আযানের উত্তর দিবে। কেননা আযানের উত্তর দেয়ার জন্য নির্দিষ্টভাবে একবারকে বা কোন মসজিদের আযানকে বুঝানো হয়নি। বরং রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা যখনই আযান শুনবে তখনই মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও ঠিক তাই বলবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৩)। তাছাড়া আযানের উত্তর দেয়ার জন্য অশেষ নেকী রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা মুয়াযযিনের আযান শুনলে উত্তরে সে শব্দগুলোরই পুনরাবৃত্তি করবে। আযান শেষে আমার ওপর দরূদ পাঠ করবে। কারণ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে (এর পরিবর্তে) আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করবে। 'ওয়াসীলা' হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু একজন পাবেন। আর আমার আশা এ বান্দা আমিই হব। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলা'র দু'আ করবে, কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪; আবূ দাঊদ, হা/৫২৩; মিশকাত, হা/৬৫৭)।

প্রশ্ন (২৫) : জুম'আর ছালাত শেষে কেউ যদি তার সুস্থতার জন্য দু'আ চায় তাহলে কি তার জন্য সম্মিলিতভাবে দু'আ করা যাবে?

-শামিম
ডোমার, নীলফামারী।

উত্তর : সম্মিলিতভাবে দু'আ করা যাবে না। কেননা এর পক্ষে শারঈ বিধান নেই। বরং সকল মুছল্লীর কাছে আমভাবে দু'আ প্রার্থী হওয়ার চেয়ে কোন পরহেযগার হক্বপন্থী আলেমের নিকটে দু'আ চাওয়া উত্তম। তিনি চাইলে এমনিতেই দু'আ করবেন অথবা ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত পড়ে হাত তুলে দু'আ করবেন (ছহীহ বুখারী, ২/৯৪৪ পৃ.)। সবার নিকট দু'আ চাইলেও উপরোক্ত নিয়মে নিজ নিজ দু'আ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন রোগীর নিকট গেলে বা তার নিকট কোন রোগীকে আনা হলে তিনি নিম্নোক্ত দু'আ বলতেন,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَاشِفَاءَ إِلَّاشِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا.

উচ্চারণ : আযহিবিল বা'স রাব্বান্না-স ওয়াশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফ-উকা শিফ-আন লা ইয়ুগা-দিরু সাক্বামা।

অর্থ : কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার আরোগ্য ছাড়া। যে আরোগ্য ধোঁকা দেয় না কাউকে (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৭৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৯১; মিশকাত, হা/১৫৩০)।

প্রশ্ন (২৬) : ইস্তিগফারের জন্য দিনে একশবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পাঠ করা যাবে কি?

-নাজনীন পারভীন
আক্কেলপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : ইস্তিগফারের জন্য দিনে একশতবার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করা যাবে। আগার আল মুযানী رضي الله عنه বলেছেন, আমার অন্তরে মরিচা পড়ে আর ওই মারিচা পরিষ্কার করার জন্য আমি দিনে একশতবার করে ইস্তিগফার পাঠ করি (ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০২; তাবারানী, হা/৮৮৩; মুসতাদরাকে লিল হাকিম, হা/১৮৮১)। তবে অপর বর্ণনায় সত্তরের অধিকবার পড়ার কথাও এসেছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,'আল্লাহর কসম! আমি প্রতিদিন সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তওবা করি (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৭; মিশকাত, হা/২৩২৩)।

প্রশ্ন (২৭) : সাপ ও বিচ্ছু থেকে বাঁচার জন্য কী দু'আ পড়তে হবে?

- মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর শেখানো একটি দু'আ বর্ণিত আছে, সেটি আমল করলে সাপ-বিচ্ছুর দংশন থেকে বাঁচা যাবে। আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর কাছে একজন লোক এসে বলল, আল্লাহর রাসূল! আমি গতরাতে একটি বিচ্ছুর দংশনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। তিনি বললেন, সন্ধ্যাবেলায় তুমি যদি এই দু'আ পড়তে। তাহলে সে তোমাকে কোনো ক্ষতি করতে পারত না। দু'আটি হল,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ : আমি আল্লাহ তাআলার পূর্ণ কালাম দ্বারা তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, (ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০৯; মিশকাত, হা/২৪২৩)। তিরমিযীতে তিনবার পাঠের কথা উল্লেখ আছে (আলবানী, তিরমিযী, হা/৩৪৩৭)।

আদব-আখলাক

প্রশ্ন (২৮) : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রেখে কারো নাম 'মুহাম্মাদ' বা 'আহমাদ' রাখা যাবে কি?

-ফুরকান
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : আহমাদ এবং মুহাম্মাদ এই নাম দু'টি আল্লাহ প্রদত্ত আমাদের নবী ﷺ এর নাম (আছ-ছাফ, ৬; আল-আহযাব, ৪০)। এই দু'টি নাম দ্বারা ব্যক্তির নাম রাখাতে শারয়ী কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। জাবের ইবনু আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির একটি পুত্র জন্ম নিল। সে তার নাম রাখল মুহাম্মাদ। তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে বলল, আমরা তোমাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নামে নাম রাখার অবকাশ দিব না। সে তখন তার ছেলেটিকে পিঠে বয়ে নিয়ে চলল এবং রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার একটি ছেলের জন্ম হলে আমি তার নাম রাখলাম মুহাম্মাদ। তাতে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বলছে, আমরা তোমাকে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নামে নাম রাখার অবকাশ দিব না। তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ, তবে আমার উপনাম অনুসারে উপনাম গ্রহণ করবে না। কেননা আমি হলাম قَاسِمٌ বা বণ্টনকারী; তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে থাকি। সুতরাং তোমরা আবুল কাসিম কুনিয়াত গ্রহন করবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৩১১৫)। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম–এর কুনিয়াত দ্বারা নাম না রাখার বিধানটি ছিল তাঁর জীবদ্দশায় প্রযোজ্য। তবে বর্তমানে তাঁর নাম, উপনাম ও কুনয়াত দ্বারা নাম রাখায় কোন সমস্যা নেই।

হালাল-হারাম→ ঘুষ, দুর্নীতি

প্রশ্ন (২৯) : কয়েক বছর আগে ঘুষ দিয়ে চাকরি নিয়েছি। কিন্তু এটা যে মহা অন্যায় তখন জানতাম না। বর্তমানে যদি ক্ষমা চাই তাহলে কি আমার বেতন হালাল হবে? না-কি চাকুরী ছেড়ে দিতে হবে?

-মাসুদ রানা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : ঘুষ সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং অভিশপ্ত বিষয়। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন, সুদ গ্রহীতার উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও উহার সাক্ষীদ্বয়ের উপর এবং বলেছেন এরা সকলেই সমান (ছহীহ মুসলিম, হা/৪১৭৭; মিশকাত, হা/২৮০৭)। কোনো ব্যক্তি যোগ্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও যদি ঘূষ ছাড়া চাকুরি না হয়; তাহলে সে ব্যক্তি তার প্রাপ্য অধিকার পাওয়ার জন্য ঘুষ দিয়ে চাকুরি নিতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহিতা ব্যক্তি বা কোম্পানী পাপী হবে। এমন ব্যক্তির চাকুরি দ্বারা উপার্জিত বেতন/অর্থ বৈধ হবে (লাজনা দায়েমা, ফাতাওয়া-৭২২৬৮)। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি অযোগ্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও ঘূষের বলে চাকুরি নেয়। তাহলে তা ধোকা হবে এবং এই চাকুরি দ্বারা উপার্জিত বেতন/অর্থ হারাম হবে এবং যোগ্য ব্যক্তির হক্ব নষ্টের জন্য কাবীরা গুনাহ হবে। এই অবস্থায় হারাম থেকে বাঁচার জন্য সেই চাকুরি ছেড়ে দিতে হবে।

হালাল-হারাম→ প্রসাধনী-সৌন্দর্য

প্রশ্ন: (৩০) বর্তমানে যুবতী মেয়েরা বিউটি পার্লারে গিয়ে বিউটিশিয়ানদের মাধ্যমে যেভাবে রূপচর্চা করছে, তা কি শরী'আত সম্মত?

উত্তর : বর্তমানে বিউটিশিয়ানদের মাধ্যমে মেয়েরা যেভাবে রূপচর্চা করছে এবং চুল ছেঁটে, ভ্রূ চিকন করে ও উলকী ব্যবহারের মাধ্যমে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে, তা শরী'আত সম্মত নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শরীরে উলকি অঙ্কনকারী, উলকি গ্রহণকারী, চুল-ভ্রূ উত্তোলনকারী, দাঁত চিকনকারী ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টিকারী নারীদের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন। কেননা তা তাঁর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়'.... (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৫; মিশকাত, হা/৪৪৩১)। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'কৃত্রিম চুল ব্যবহারকারী ও এর বেশধারী এবং শরীরে উলকি অঙ্কনকারী ও উলকি গ্রহণকারী নারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২২; মিশকাত, হা/৪৪৩০)।

উল্লেখ্য যে, পার্লারের বিউটিশিয়ানরা যুবতী মেয়েদের সাজানোর সময় তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ ও দর্শন করে তা স্বামী বা অন্যের নিকটে প্রকাশ করতে পারে। ফলে তারা তাদেরকে অন্তরের চোখ দিয়ে কল্পনা করে ও দেখে থাকে। যা যিনার শামিল। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো নারী যেন অপর কোনো নারীর সাথে ঘনিষ্ঠতার সাথে সাক্ষাতের পরে স্বীয় স্বামীর সামনে উক্ত নারীর (রূপের) এরূপ বর্ণনা না করে, যাতে স্বামী যেন তাকে দেখছে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৪০; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২২; মিশকাত, হা/৩০৯৯)। অতএব এরূপে রূপ চর্চা করা যাবে না। তবে নিষিদ্ধ সামগ্রী ব্যতীত বৈধ সামগ্রী দ্বারা বাড়ীতে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সাজতে পারে।

হালাল-হারাম→ আচার-অনুষ্ঠান

প্রশ্ন (৩১) : বিয়েতে জাকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করা এবং নতুন বউকে আগত মেহমানদেরকে দেখানোর বিধান কী?

-আহসানুল্লাহ বিন আজাদ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : সাদামাঠাভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান করা উত্তম। তবে কারো যদি সামর্থ্য থাকে বিয়েতে অপচয় না করে অনৈসলামীক কার্যকলাপ (গান-বাজনা, আতশবাজী ইত্যাদী) থেকে বিরত থেকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী সকলকেই বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, 'রহমানের বান্দা তারাই যারা খরচ করলে অপব্যয় করে না

www.al-itisam.com

আবার কৃপনতাও করে না। তারা এই দুইয়ের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করে' (আল-ফুরক্বান, ২৫/৬৭)। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না' (আল-আনআম, ৬/১৪১)। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনু আউফের গায়ে হলুদ চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কী? সে বলল, (আল্লাহর রাসূল!) আমি খেজুর দানার সমপরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুক! তুমি একটি ছাগল দিয়ে হলেও অলিমা করো' (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৬৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২৭; মিশকাত, হা/৩২১০)।

অন্যদিকে নতুন বউকে ঢালাওভাবে সকলের দেখার জন্য উম্মুক্ত করে দেওয়া হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা বাড়িতে অবস্থান করো, পূর্বেকার জাহেলী যুগের নারীদের মতো রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না' (সূরা আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন শ্রেণির ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করেছে। ১. নেশাদার দ্রব্য পানকারী, ২. পিতা-মাতার অবাধ্য সান্তান, ৩. ঐ পুরুষ যে তার পরিবারে বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা, অশ্লিলতা ও বেপর্দার সুযোগ করে দেয়' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৬১১৩; মিশকাত, হা/৩৬৫৫)।

প্রশ্ন (৩২) : প্রতিযোগিতামূলক কোনো 'কুইজ প্রতিযোগিতা'য় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার ক্ষেত্রে কি লটারি করা যাবে?

-আব্দুল আহাদ
রানীরবন্দর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : কুইজ প্রতিযোগিতা ও শিক্ষার্থী ভর্তির উদ্দেশ্য যদি হয় ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা তাহলে তাতে লটারী করা যায়। কেননা যে লটারীতে টাকা-পয়সার হার-জিত থাকে না সে লটারী জায়েয। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লটারীর মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফরে যেতে ইচ্ছা করতেন, তখন তার স্ত্রীদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করতেন এবং তাতে যার নাম উঠত তিনি তাকেই সাথে নিয়ে যেতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৯৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৭০; মিশকাত, হা/৩২৩২)।

উল্লেখ্য যে, হারাম হল ঐ লটারী যার মাধ্যমে অনেকের নিকট থেকে টাকা নিয়ে ২/৪ জনকে পুরস্কৃত করা হয় এবং তাতে জুয়ার সংমিশ্রন থাকে। কেননা জুয়ামূলক সব ধরনের খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তির বেদী এবং শুভ-অশুভ নির্ণয়ের তীর এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো, যেন তোমাদের কল্যাণ হয় (সূরা আল-মায়েদাহ, ৯০)।

হালাল-হারাম→খাদ্য-পানীয়

প্রশ্ন (৩৩) : শিশু ৩/৪ বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করলে পাপ হবে কি?

-মোফাজ্জল
গাজীপুর।

উত্তর : সন্তানকে পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়ানো যাবে। তবে পিতা-মাতা ইচ্ছা করলে দুই বছরের কম-বেশীও করতে পারে। তাতে কোন পাপ হবে না (সূরা বাক্বারাহ : ২৩৩; তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৩৪২ পৃঃ)। দুই বছরের বিষয়টি দুধ মা প্রমাণের জন্য। নিজ বাচ্চাকে মা প্রয়োজন মত দুধ পান করাবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য →সূদী কারবার

প্রশ্ন (৩৪) : আমি এটিএম কার্ড ব্যবহার করি। এখানে মাসে মাসে টাকা সূদ দেওয়া হয়। আমি সেই টাকাগুলো (সূদের টাকা) কোনো গরীব-মিসকীন বা কোনো মসজিদে দান করলে নেকী বা পাপ হবে?

আহসানুল্লাহ বিন আজাদ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : সূদের টাকা ভক্ষণ করলে পাপ হবে। কিন্তু কাউকে তা দিয়ে দিলে নেকী বা পাপ কিছুই হবে না। কারণ সূদের টাকা কোনো ব্যক্তির নিজের বৈধ সম্পদ নয়। বরং সূদ আদান-প্রদান করা সুস্পষ্ট হারাম (সূরা আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। তাই নেকীর উদ্দেশ্য ছাড়া মাদরাসা কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে দিয়ে দিতে হবে। তবে মসজিদে না দেওয়াই উচিত।

চিকিৎসা

প্রশ্ন (৩৫) : আযল ব্যতীত জন্মনিয়ন্ত্রণের যেকোন মাধ্যম গ্রহণ করে বীর্য অপচয় করলে কি বাচ্চা নষ্ট করার মত গুনাহ হবে?

-জেসমিন
রামপুরা, জয়পুরহাট।

উত্তর : গুরুতর কারণ যেমন- অসুস্থতা, মৃত্যুর আশঙ্কা ইত্যাদি ছাড়া অধিক সন্তানের ভরণ-পোষণের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা শরী'আত পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা খাদ্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে এবং তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি' (সূরা বানী ইসরাঈল : ৩১)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা অধিক প্রেমানুরাগিণী, অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী মহিলাকে বিয়ে করো। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব' (আবুদাঊদ, হা/২০৫০; নাসাঈ, হা/৩২২৭; মিশকাত, হা/৩০৯১, সনদ ছহীহ)। তবে স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে আযল বা সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায়। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কুরআন মাজিদ নাযিল হচ্ছিল তখন আমরা আযল করতাম (ছহীহ বুখারী, হা/৫২০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪০; তিরমিযী, হা/১১৩৭; মিশকাত, হা/৩১৮৪)।

পারিবারিক বিধান→আক্বীকা

প্রশ্ন (৩৬) : আমি পড়াশুনার জন্য পরিবারসহ অস্ট্রেলিয়ায় থাকি। এখানেই আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। আমি বাংলাদেশে আমার গ্রামের বাড়িতে সপ্তম দিনে তার আক্বীকা দিতে চাই। এটা জায়েয হবে কি? নাকি অস্ট্রেলিয়াতেই আক্বীকা করতে হবে?

-মনির
পি.এইচ.ডি গবেষক, এডিলেইড, অস্ট্রেলিয়া।

উত্তর : আক্বীক্বা করার বিষয়টি কোনো স্থানের সাথে নির্ধারিত নয়; বরং সপ্তম দিনের সাথে নির্দিষ্ট। তাই সপ্তম দিনের হিসাব ঠিক রেখে শিরকী স্থান ব্যতীত যে কোনো স্থানে আক্বীক্বা করলে আক্বীক্বা হয়ে যাবে- ইনশাআল্লাহ। সামুরা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, প্রতেক শিশু তার আকীকার সাথে বন্ধক/দায়বদ্ধ থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবাই করতে হবে, তার মাথা কামাতে হবে এবং নাম রাখতে হবে' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২০২০১; ইবনু মাজাহ, হা/৩১৬৫)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ছাহাবাদের পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল ও কন্যা সন্তানের জন্য একটা ছাগল আক্বীক্বা করার আদেশ করেছেন (তিরমিযী. হা/১৫১৩)।

পারিবারিক বিধান→ বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (৩৭) : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর মোহরের টাকার বিনিময়ে সমপরিমাণ জমি লিখে দিয়েছেন। এখন উক্ত জমি কে আবাদ করবে এবং তার ফসল কে ভোগ করবে?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : স্ত্রী তার মোহর থেকে যদি স্বামীকে প্রদান করে তাহলে উভয় মিলে মিশে তা ভোগ করতে পারে। রাগারাগি করলে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমারা নারীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে প্রদান করবে, সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মোহরের কিয়দাংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করবে' (সূরা আন-নিসা, ৪)।

প্রশ্ন (৩৮) : বিয়ের দুই দিন পর মেলামেশার পূর্বেই স্ত্রী খোলা করলে তাকে কতদিন ইদ্দত পালন করতে হবে?

-লুৎফর রহমান
শান্তাহার, বগুড়া।

উত্তর : বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি নির্জনবাস হয়ে থাকে (শারীরিক সম্পর্ক হোক বা না হোক), তাহলে তা শারীরিক মিলন বলে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে এক হায়েয ইদ্দত পালন করতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত। ছাবিত ইবনু ক্বায়স (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর স্ত্রী তার কাছ থেকে খোলা তালাক নিলেন। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ইদ্দাতকাল নির্ধারণ করলেন এক হায়েয (আবূ দাঊদ, হা/২২২৯)। সাথে সাথে স্বামী থেকে প্রাপ্ত সকল মোহর তাকে ফেরত দিবে। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, ছাবিত ইবনু ক্বায়স (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর স্ত্রী নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! ছাবিত ইবনে ক্বায়স (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর ব্যবহার ও দ্বীনদারী সম্পর্কে আমার কোনো অভিযোগ নেই, কিন্তু ইসলামের ছায়ায় থেকে আমার দ্বারা স্বামীর অবাধ্যতা পছন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তবে কি তুমি তার বাগান তাকে ফেরত দিবে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি তোমার বাগান গ্রহণ করো এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৭৩; মিশকাত, হা/৩২৭৪)।

প্রশ্ন (৩৯) : বিবাহ করতে চাচ্ছি কিন্তু বাবা-মা রাজি হচ্ছে না। আমি কি তাদেরকে উপেক্ষা করে বিবাহ করতে পারি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : পুরুষ লোক বিবাহের ক্ষেত্রে স্বাধীন। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার সম্মতি আবশ্যক নয় যেমন মেয়ের জন্য তা আবশ্যক (তিরমিযী, হা/১১০২; মিশকাত, হা/৩১৩১)। তবে তাদেরকে বুঝিয়ে তাদের সম্মতিতেই বিবাহ করা ভালো। কিন্তু পিতা-মাতা যদি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের বিবাহ দিতে না চায়, অথচ তার পাপে জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই পুরুষ মানুষ বিবাহ করতে পারে।

প্রশ্ন (৪০) : আমাদের এলাকায় কোনো মেয়েকে তালাক দিলে পুনরায় বিবাহ দেয়ার জন্য হিল্লা করা হয়। এই হিল্লা বিবাহ কি শরীআত সম্মত?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : 'হিল্লা বিবাহ' শরীআতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। উক্ববা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের ভাড়াটিয়া পাঁঠা সম্পর্কে বলব না? তারা বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তিনি বললেন, সে হলো হিল্লাকারী। আর হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কেই আল্লাহ লা'নত করেছেন' (ইবনু মাজাহ, হা/১৯৩৬; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/১৪১৮৭)।

প্রশ্ন (৪১) : স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেছে বলে কি প্রথম স্ত্রীর তালাক চাওয়া বৈধ, যদিও বিবাহ বৈধভাবে শরীয়তসম্মত হয়?

-রবীউল ইসলাম
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : শরীয়তের শর্ত মেনে দুজনকেই সুখে রাখতে পারলে প্রথমার তালাক চাওয়া বৈধ নয়। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে স্ত্রীলোক অকারণে তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাইবে, সে স্ত্রীলোকের জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যাবে' (আবূ দাঊদ, হা/২২২৬, ইবনু মাজাহ, হা/২০৫৫; মিশকাত, হা/৩২৭৯)। অনুরূপভাবে দ্বিতীয়ার জন্যও বৈধ নয় প্রথমাকে তালাক দিতে স্বামীকে চাপ দেওয়া। কারণ আল্লাহ যার যতটুকু রিযিক্ব নির্ধারণ করে রেখেছেন সে ততটুকুই ভোগ করতে পারবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কোনো নারী যেন তার বোনের তালাক না চায়, তার পাত্রকে উল্টিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিজে ভোগ করার জন্য। বরং তাকেই যেন বিবাহ করে নেয়। আল্লাহ যার যতটুকু রিযিক্ব নির্ধারণ করে রেখেছেন সে ততটুকুই ভোগ করতে পারবে' (বুখারী, হা/৬৬০১; মিশকাত, হা/৩১৪৫)।

মৃত্যু-কবর-জানাযা

প্রশ্ন (৪২) : খাদিজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে দাফন করার পরে সবাই ফিরে গেলেন। কিন্তু রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এটা দেখে ছাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাবেন না। তিনি বললেন, না, কবরে খাদিজার তিনটি প্রশ্নের জবাব না হওয়া পর্যন্ত যাব না। কিন্তু কবরের নিকটে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ফেরেশতাও আসছে না। তখন আল্লাহ বললেন, এই প্রশ্নের উত্তর আমিই দিয়ে দিলাম। এমন ঘটনার কোনো প্রমাণ আছে কি?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : এই বক্তব্যের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তা মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৪৩) : জানাযার ছালাতে পায়ের সাথে পা, কাধে কাধ মিলাতে হবে কি?

-শাকিল হোসাইন
চরগগনপুর, জামালপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, পায়ের সাথে পা ও কাধে কাধ মিল করেই দাঁড়াতে হবে। কারণ অন্য ছালাতের মত এটাও একটি ছালাত। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নাজাশীর জানাযায় সারিবদ্ধ হন এবং চার তাকবীরে জানাযা পড়ান। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আজ হাবশা দেশের একজন নেককার লোক মৃত্যুবরণ করেছে। তাই তোমরা এসো তার জানাযার ছালাত আদায় করো। রাবী বলেন, আমরা তখন কাতারবন্দি হয়ে দাড়াঁলাম। অতঃপর তিনি তার জানাযা ছালাত আদায় করালেন। আমরা ছিলাম কয়েক কাতার' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩২০; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪১৮৩)। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, আমরা জনৈক ব্যক্তির জানাযায় রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম (ছহীহ বুখারী, হা/১৩২১; মিশকাত, হা/১৬৫৮)।

প্রশ্ন (৪৪) : জানাযার ছালাতে ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীদেরকে কি সব দু'আ-কালাম পড়তে হবে?

-আব্দুর রশীদ রনি
চন্দ্রগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।

উত্তর : ইমাম সরবে পড়লে মুক্তাদীগণ আ'ঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ কেবল সূরা ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে এবং পরে দরূদ ও অন্যান্য দু'আ সমূহ পড়বে। তবে ইমাম নীরবে পড়লে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা এবং অন্যান্য দু'আ সমূহ পড়বে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কোনো মৃতের জানাযা পড়লে তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করবে (আবুদাঊদ, হা/৩১৯৯; ইবনে মাজাহ, হা/১৪৯৭; বায়হাক্বী, হা/৬৭৫৫)।

প্রশ্ন (৪৫) : নয় মাসের গর্ভবতী বাচ্চা পেটে মারা গেছে। অপারেশন বা সিজার করে তাকে বের করার পর তার কি জানাযা দিতে হবে?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : না, এমতাবস্থায় তার জানাযা দিতে হবে না। শু'আইব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। ইবনু শিহাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ... নবজাত শিশু সরবে কেঁদে থাকলে তার জানাযার ছালাত আদায় করা হবে। আর যে শিশু কাঁদবে না, তার জানাযার ছালাত আদায় করা হবে না। কেননা, সে অপূর্ণাঙ্গ সন্তান (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৫৮)।

অপরাধ-দণ্ডবিধি

প্রশ্ন (৪৬) : কেউ যদি অন্যায় করে এবং সে কারণে তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হয়। তাহলে কি তাকে ঐ অন্যায়ের শাস্তি পুনরায় পরকালে পেতে হবে?

-আহসানুল্লাহ বিন আজাদ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : কেউ পাপ বা অন্যায়ের শাস্তি দুনিয়াতে পেয়ে গেলে তাকে আর পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) -

বলেন,...‘যে ব্যক্তি (শিরক ব্যতীত) অন্য কোন অপরাধ করবে এবং এজন্য দুনিয়ায় শাস্তি পেয়ে যাবে, তাহলে এ শাস্তি তার গুনাহ মাফ হবার কাফফারাহ্ হয়ে যাবে। আর যদি কোন গুনাহের কাজ করে, অথচ আল্লাহ তা ঢেকে রাখেন (বা ধরা না পড়ে), এজন্য দুনিয়ায় এর কোন বিচার না হয়ে থাকে, তাহলে এ কাজ আল্লাহর মর্যীর উপর নির্ভর করবে। তিনি ইচ্ছা করলে আখিরাতে তাকে ক্ষমা করে দিবেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭০৯; মিশকাত, হা/১৮)।

প্রশ্ন: (৪৭) ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন নারী কি জীবন দিতে পারে?

উত্তর : ধর্ষিতা পাপী হবে না। সুতরাং ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন নারী জীবন দিতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা আত্মহত্যা করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে এটা করবে তাকে অগ্নিতে দগ্ধ করাবো। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য (আন-নিসা, ২৯-৩০)। অতএব, বালা-মছীবত ও ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করা যাবে না। বরং ধৈর্য ধারণ করতে হবে ও আল্লাহর নিকট দু‘আ করতে হবে। মাযলূমের দু‘আ আল্লাহ কবুল করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,‘ হে মু‘আয! মাযলূমের বদ দু‘আ থেকে বেঁচে থাক। কেননা তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই’ (ছহীহ বুখারী হা/২২৬৮; তিরমিযী হা/১৯৩৭)।

আখিরাত

প্রশ্ন (৪৮) : ক্বিয়ামতের দিন পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সাথে অন্য সব গ্রহও কি ধ্বংস হবে?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের যা কিছু আছে সবকিছুই ক্বিয়ামতের দিন ধ্বংস হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘পৃথিবী পৃষ্ঠে যা আছে সবই ধ্বংসশীল, কিন্তু চিরস্থায়ী তোমার প্রতিপালকের চেহারা (সত্তা)- যিনি মহীয়ান, গরীয়ান’ (আর-রহমান, ৫৫/২৬, ২৭)। তিনি আরো বলেন, ‘সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত’ (আল-ক্বাছাছ, ২৮/৮৮)। তিনি বলেন, ’যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। যখন তারকাগুলো খসে পড়বে’ (আত-তাকবীর, ৮১/১, ২)। তিনি বলেন, যখন আসমান চুর্ণ-বিচুর্ণ হবে। যখন তারকা সব ঝরে পড়বে’ (আল-ইনফিতার, ৮২/১, ২)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯) : মহিলাদের তা‘লীমী বৈঠকে ১০-১৫ বছর বয়সের ছেলেরা কি কোনো জ্ঞানমূলক বা ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য দিতে পারবে কি?

-আহসানুল্লাহ বিন আজাদ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত বয়সের ছেলে বালেগ হলে পর্দার বিষয়টি নিশ্চিত করে আড়াল থেকে তা‘লীমী বৈঠকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে জ্ঞানমূলক বক্তব্য পেশ করাতে শারঈ কোনো বাধা নেই। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে’...(আন-নূর, ২৪/৩১)। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, মহিলারা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বললেন, (হে আল্লাহর নবী!) পুরুষেরা তো (দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে) আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। অতএব, আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন, (যে দিনে আমরা আপনার থেকে দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল শিখবো)। অতঃপর তিনি তাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিলেন। ঐ দিনে তারা একত্রিত হত আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের উপদেশ দিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১০১; মুসনাদে আহমাদ, হা/১১৩১৪)।

প্রশ্ন (৫০) : কোন গায়র মাহরাম ড্রাইভারের সাথে মহিলার একাকিনী কোথাও যাওয়া বৈধ কি?

-আবিদা সুলতানা
চরবাগডাঙ্গা, চাপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : না; গাড়ি, রিক্সা বা বাইকে এমন কোন পুরুষের সাথে মহিলার একাকী যাওয়া বৈধ নয়, যার সাথে কোনও সময় তার বিবাহ বৈধ। বাস, ট্রেন, প্লেন বা জাহাজের কোন সফরে যাওয়া, এমনকি কোন ইবাদতের সফরেও নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, তার মাহরামের সঙ্গ ছাড়া একাকিনী এক দিন এক রাতের দুরত্ব সফর করা বৈধ নয় (ছহীহ বুখারী, হা/১০৮৮; ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৯)। তিনি আরো বলেন, ‘কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে। এক ব্যক্তি বলল, হে আলাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে বের হয়েছে, আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি। তিনি বললেন, যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর। (বুখারী, হা/৩০০৬; মুসলিম, হা/১৩৪১)। কারণ যখন কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখন শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী হয়। (তিরমিযী, হা/১১৭১; মিশকাত, হা/৩১১৮)।

মাসিক আল-ইতিছামে প্রশ্ন জমাদানের জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল : ০১৭০৯-৭৯৬৪৩৮
ওয়েব : al-itisam.com

ডাক যোগাযোগ : সম্পাদক, মাসিক আল-ইতিছাম
আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

www.al-itisam.com

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন:

আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর)

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Jamiah As Salafiya General Fund
Account No: 20501130204367701

Account Name: Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund
Account No: 20501130204367417

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ- ঢাকা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Account No: 20501130204367316

দাওয়াহ কার্যক্রম

মাসিক আল-ইতিছাম, আল-ইতিছাম টিভি, আল-ইতিছাম গবেষণাগার, আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, দাঈ নিয়োগ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Itisam Dawah Fund
Account No: 20501130204367802

ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ সহায়তা ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Tran Tahbil Fund
Account No: 20501130204367903

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রম

দুস্থ, ইয়াতীম শিক্ষার্থী প্রতিপালন।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Yatim Kollan Fund
Account No: 20501130204367600

বিকাশ এজেন্ট : ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ | বিকাশ পার্সোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ ; ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ ; ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ | রকেট পার্সোনাল : ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ ; ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮-৭

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

নিবরাস প্রকাশনী কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বইসমূহ

আদর্শ পরিবার

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ২৫৬ | মূল্য : ১৫০ টাকা

মরণ একদিন আসবেই

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ২৮৮ | মূল্য : ১৫০ টাকা

কে বড় লাভবান

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ২৬০ | মূল্য : ১৫০ টাকা

রিযিক্ব

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ৯৬ | মূল্য : ৭০ টাকা

তাফসির কি মিথ্যা হতে পারে?

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ১৯৬ | মূল্য : ১০০ টাকা

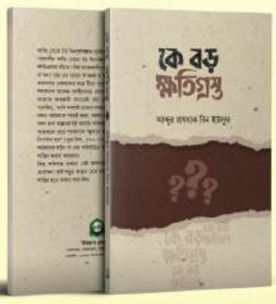

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ২৮০ | মূল্য : ১৫০ টাকা

যোগাযোগ : নিবরাস প্রকাশনী

রাজশাহী শাখা : এমাদ আলী প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬
বাংলাবাজার শাখা : গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৪০৭-০২১৮৫০

الاعتصام Al-Itisam TV

কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার লক্ষ্যে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ইতিছাম টিভি। শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ সহ অন্যান্য আলোচকদের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নিয়মিত দারস পেতে আল-ইতিছাম টিভি সাবস্ক্রাইব করুন!

www.facebook.com/alitisamtv www.youtube.com/c/alitisamtv